International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 1-23
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

অমর মিত্রের গল্পে 'দেশভাগ' : উত্তর প্রজন্মের চোখে বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়,নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The Partition of India became an inevitable reality in the wake of successive events in Bengal. However, the Partition experience on India's eastern front was very different from that on its western border. Literature has emerged as an alternate archive of the times. In the study of the partition of the Indian subcontinent, in particular, literature has articulated the little narratives against the grand; the unofficial histories against the official. Amar Mitra (born 30 August 1951) is an eminent writer in Bengali living in Kolkata, West Bengal, India. A student of Chemistry, he has been working for the Land Reforms Department of The Government of West Bengal. He was awarded with Sahitya Academi Award for his novel 'Dhurbaputra' in 2006. He has also received the Bankim Puraskar from Government of West Bengal for his novel 'Aswacharit' in 2001.His latest published work 'Harano Desh Harano Manush'—an anthology of a novel and 13 short stories on partition. The stories in this anthology show how the socio-economic fabric of an inter-dependent society on either side of the eastern border slowly changed and was finally ripped apart by Partition. He also sketched how the Dream and fantasy of later-partition is evolving gradually and works into the true consciousness of next generation, how they feel the grieves of alienation from the Root, how the friendships were tested, loyalties were being changed and how the humanity of some people were surfaced in spite of the divisive politics. He illustrated the endless struggle of the East Bengal as well as East Pakistan refugees and portrayed the continuing relevance of the border or Radcliffe Boundary. The stories also show the sense of uncertainty that still grips the different community on either side of this demarcating line.

অমর মিত্র একালের এক প্রথিতযশা ছোটগল্পকার। তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালের ৩০শে আগস্ট পূর্ববঙ্গের সাতক্ষীরা উপজেলার ধূলিহর গ্রামে। প্রধানতঃ কথাসাহিত্যিক। একসময় নানা সূত্রে পাড়ি দিয়েছেন বাংলা সহ ভারতবর্ষের বহু শহরে ও গ্রামে। বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের মানবিক সত্তাকে নিপুণভাবে তুলে এনেছেন তিনি তাঁর গল্পে। এপার ও ওপার বাংলার মানুষদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁর বেশ কিছু গল্পে দেশভাগের দুঃখ আর যন্ত্রণার নিপুণ চিত্র চোখে পড়ে। উত্তর প্রজন্মের মনে ও মননে দেশভাগের ক্ষত যে এখনও শুকোয়নি শ্রীমিত্রের গল্পগুলি তারই প্রমাণ। বিশেষ করে পূর্ববাংলা থেকে এ বঙ্গে আগত এবং দেশভাগের পরেও পূর্ববাংলায় থেকে যাওয়া মানুষগুলির স্মৃতি ও অনুভব নস্ট্যালজিক আয়তনে প্রসারিত হয়েছে তাঁর গল্পে। একই বিষয়বস্তুর উপর লেখা তাঁর লেখা 'ধূলোগ্রাম'(২০১৫) এক অসাধারণ উপন্যাস। এ উপন্যাসের শুভময়ের কৈশোর অথবা সৎ রামরতনের সেটেলমেন্ট অফিসারের চাকরীর মধ্যেও আছে আত্মানুসন্ধানের বীজ। এ উপন্যাসের 'আমতলি' সেই আদর্শ মন-নগর যেখানে বাসা বেঁধে

থাকে স্বজন হারানো উদ্বাস্তু মানুষের দল যাঁরা মেনে নিতে পারে না রাষ্ট্রের কৌশলী বিভাজন বার্তা। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সেটেলমেন্টে এমন অনেক 'আমতলী'-ই তৈরী করেছিলেন সেদিনের স্বদেশ ও স্বজন হারানো মানুষেরা। 'দেশভাগ' বিষয়ক তাঁর ছোটগল্পগুলি হলো—'নদীর ওপার', 'হারানো নদীর স্রোত', 'অন্ন-পরমান্ন', 'অলীক ক্রন্দনধ্বনি', 'দমবন্ধ', 'হোসেন মিঞার নাও', 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল', '২৫-১২৫', 'চোখ আর নদীর জল', 'সাঁকোবাড়ি', 'বনহংসীর দেশ', 'দেশের কথা গাঁয়ের কথা', 'সৌদামিনী ও সুরদাস' প্রভৃতি।

অমর মিত্রের জন্মভিটে 'ধূলিহর' গ্রাম বা 'ধুলোর'-এর কথা প্রায়বার ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। তাঁর গল্পগুলি পড়লে মনে হয়, সত্যিই আমাদের পিতৃ-পিতামহরা বিশ্বাস করতেন না 'পার্টিশন' বলে কোনো বিষয় থাকতে পারে বলে। তাদের কাছে দেশের মাটি আর মানুষ ছিল এক আর অভিন্ন। 'দেশভাগ' হবার পর 'পার্টিশন' কথাটা বারবার ফিরেছে ওপারের মানুষের মুখে-মুখে। আজও ফেরে। হৃদয় সঞ্জাত সেই বেদনা গাঁথার আজও অনুরণন ঘটে চলে। স্মৃতি আর মননে অতীতের স্বর্ণময় দিন, আর তা হারানোর যন্ত্রণা যেন আজ—এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও কুরে কুরে খায় তাদের। একথা সত্যি যে, 'দেশভাগ'-এর প্রত্যক্ষ ফলভোগী মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসছে। অমর মিত্রের গল্পে 'দেশভাগ'-এর পর এপার-ওপার—দুপার বাংলার মানুষের কথাই বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে। এসেছে তাদের গ্রাম—ঘনিষ্ট জীবনের ছোট-ছোট অভিজ্ঞতা, দুঃখ আর অনুভূতির কথা—তাদের স্বপ্নময় কল্পনার কথা। এসেছে ওপার বাংলা নিয়ে মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনানুভব। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ, ছিটমহল, শাহবাগ আন্দোলনের টুকরো টুকরো ছবিও কথাচিত্র হয়ে উঠেছে কোনো কোনো গল্পে।

'৪৭-এর ভারত বিভাজন কিম্বা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলার মানুষের হৃদয়কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। কেমনভাবে লাঞ্ছিত জীবনে অপূর্ণ সব বাসনা নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাদের—তারও স্মৃতিমেদুরতায় ভাস্বর অমর মিত্রের 'দেশভাগ'-এর গল্পগুলি। আজকের প্রজন্মের চোখে সেই হারানো দেশ আর হারানো মানুষের কল্পনা এক বাস্তব ছবি হয়ে ধরা পড়ে। প্রজন্মের ব্যবধান এখানে বড় কথা নয়, কারণ পরবর্তী প্রজন্মের অনুভব এখানে প্রায়শঃই পূর্ববর্তী প্রজন্মের ইতিহাসকে তার স্মৃতি ও সত্তায় সাঙ্গীকৃত করে নেয়। চারাগাছ যেন অনুভব করতে চায় প্রাচীন বটবৃক্ষের শিকড়ে ফেরার টান। স্মৃতির পথ ধরে এভাবেও যে ফেরা যায়, করা যায় আত্মানুসন্ধান—অকৃত্রিম হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা যায় নিজের দেশকে তাই যেন তুলে ধরতে চান লেখক তাঁর গল্পে। এপার বাংলার মানুষের মনে যখন দুই 'দেশভাগ'-এর স্মৃতি বলে আর প্রায় কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই—সেখানে এপার ও ওপার পরস্পর প্রতিবেশী এই দুই বাংলার মানুষ ও মাটির হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রয়াস আর যাই হোক্ নিছক কল্পনা-বিলাসিতা যে নয়—তা অমর মিত্রের যে কোনো গল্পপাঠেই উপলব্ধি হয়।

ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশের বুকে অবস্থিত বঙ্গ ভূখণ্ডের বারংবার বিভাজন মাটিকে ভাগ করেছে সত্য, কিন্তু তা যে মানুষকে ভাগ করতে পারে নি, ভাগ করতে পারে নি বাঙালির আবেগকে তা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্য যে প্রায়শঃই নির্মম হয়— 'দেশভাগ' বাঙালিকে তার অন্তর দিয়ে তা অনুভব করাতে সাহায্য করেছে। বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমানের কাছে 'দেশভাগ' আজও সহসা স্মৃতিসৌরভে ফিরিয়ে দেয় তার একত্রিত সেইসব মধুর অতীত—যার নির্যাস রোমন্থনেই হয়তো হৃদয়ের সবটুকু পরিতৃপ্তি সম্ভব। সীমান্তের ওপারে জীবনের শিকড়কে ফেলে রেখে আসা মানুষের দল এপার বাংলায় চলে এসে কি তার এতদিনকার সবকিছুকে অতি সহজেই ভুলে যেতে পারে? কল্পনার উৎসারে তার মন কি দোলায়িত হয় না বারংবার? পিতৃকূল-মাতৃকূলের বেদনা যখন আবেগে আতপ্ত উত্তরাধিকার নিয়ে আছড়ে পড়ে দুই বাংলার বুকে তখনই তো শিকড় ছিন্নতার যন্ত্রণা আরও তীব্র—আরও প্রসারিত হয়। একদিকে ভাগের ভূখণ্ড আর অন্য দিকে ভাগের মানুষ—এই দুয়ের টানাপোড়েন জন্ম দেয় যে মানবিক সংকট, বপন আর বহন করে চলে দীর্ণতার বীজ—অমর মিত্রের 'দেশভাগ'-এর গল্প তারই সার্থক রূপায়ন ঘটায়। তাঁর গল্প সেই ভাঙা দেশ আর ভাঙা মানুষেরই এক ধূসর পাণ্ডুলিপি।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজন ও খন্ডিত স্বাধীনতা যে বিপদ ও বিপন্নতার জন্মদান করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সন্নিহিত পঞ্জাব প্রদেশ সহ পশ্চিম পাকিস্তানে পড়েছিল অনেক বেশী। অথচ তার পরোক্ষ ফল '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে কুরে কুরে খেয়েছে পূর্ববঙ্গের (বলা ভালো পূর্ব পাকিস্তান) নাগরিক অধিকার ও তার মানবিক অস্তিত্বকে। **প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অন্নদাশংকর রায়ের মতানুযায়ী বলা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে কিছু থাকতে পারে না।**[১] কিন্তু ইসলামিক দেশ পাকিস্তান তার উত্তর দিয়েছে অন্যভাবে। বলাবাহুল্য ইসলামীয় ধর্মনৈতিক দৃষ্টিকোণই সেখানে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও মৌলবাদী আগ্রাসন যেমন স্বাধীনতার পর আরো চব্বিশ বছর ধরে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যতে থাবা বসিয়েছে তেমনই কুক্ষিগত করে তাকে আস্বাদনও করতে চেয়েছে। অন্যদিকে '৭১-এর ভাষা আন্দোলন ও তার ফল স্বরূপ পৃথক জাতিরাষ্ট্র উদ্ভবের যুগান্তকারী ইতিহাস তাতে অন্য এক মাত্রা যোগ করেছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হলো, মৌলবাদী রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানে যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে উগ্র করে তুলেছিল, ভাষা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধ তার ঠিক বিপরীত পালে হাওয়া যুগিয়েছে। ভাষা আন্দোলন চেয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে। অন্ততঃ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র গঠনের উৎপত্তির ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। জিন্নাহ্-র দ্বিজাতিতত্ত্ব হিন্দু-মুসলমানের যে স্পষ্ট বিভাজনকে সামনে রেখে একসময় দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলার ভাষা আন্দোলন বাঙালিয়ানার মহীয়ান চেতনায় তাকে অনেকাংশেই শুদ্ধ করে তুলেছে। তবু সংগ্রামই শেষ কথা নয়। '৪৭-এর দেশভাগ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারত বিভাজনের এক কলংকিত অধ্যায়, কিন্তু '৭১-এর দেশভাগ ভারতভূমির বিভাজন ছিল না। তবুও তা এপার বাংলার আমাদের আজও এত কাতর করে কেন? কারন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলার এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে আমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছি বলে। আসলে আমাদের কাছে এ বিভাজন যতটা না দেশের তার থেকে অনেক বেশী মানুষের বিভাজন, যতটা না এর প্রভাব পড়েছে ভৌগোলিক ও মানচিত্রগত ভাবে তার থেকে এর অনেক বেশী অভিঘাত পড়েছে বাঙালির মনে ও মননে। একদিকে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান একযোগে এ বিভাজন চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য—বাংলাকে তাদের স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার দাবীতে। অন্যদিকে এ বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অত্যাচার আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে অসংখ্য বাঙালি হিন্দু ও তাদের পরিবার-পরিজনেরা ওপারের দেশ-গাঁ সহ ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল এ বঙ্গে। কেউ কেউ রয়েও গিয়েছিল শত অত্যাচার সয়ে মুখ বুঁজে আর মাথা গুঁজে। সুতরাং বাঙালি জীবনে অনেক অত্যাচার ও মৃত্যুর সাক্ষী এ 'দেশভাগ'। যদিও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি শেষমেষ এখানেও তার পিছু ছাড়ে নি। বাঙালিত্বের বোধ, বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের একযোগে লড়াই-এর বোধ, 'বাংলার মাটি—বাংলার প্রাণ'—এর একীভূত বোধী এই 'দেশভাগ'-এর অনুভবের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। পূর্ব প্রজন্মের কাছে যা ছিল জন্মভিটা—'দেশভাগ'-এর পর উত্তর প্রজন্মের কাছে তাই-ই অন্য দেশের মাটি হয়ে গেছে। নির্মম আবেগে মেনে নিতে হয়েছে সেই সত্য—বাপ্-ঠাকুরদার জন্মভিটের সে দেশ আজ আর আমার নয়, সে দেশের মাটিও আমার নয়। এ বঙ্গের বুকে আজও যারা 'বাঙাল' বলে চিহ্নিত হন তাদেরও বুকের গহনে কোথাও যেন দেশভাগের স্মৃতি রোমন্থিত হয় বলেই বিশ্বাস। মানুষী আবেগেই আজও হয়তো পূর্ববঙ্গীয় পাত্র-পাত্রীর অনুসন্ধানে ব্রতী হন কেউ কেউ। তারও পরে অনুপ্রবেশ, ছিটমহল, সীমান্ত চোরাচালান সমস্যা অথবা তিস্তা জলবন্টন চুক্তিকে সামনে এপার-ওপারের রাজনৈতিক তর্জা আর ভাবের আদান-প্রদান ঘটে চলে, আলোচনা সভায়-উৎসবে-মেলায় ঘটে চলে এপার-ওপারের সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান। কখনো ফেলে আসা অতীত নামক ছিন্ন-মূলের স্পন্দনে—আবার কখনও বা 'বাঙালি' নামক অস্তিত্বের চোরা টানে আজও একইসাথে অন্তর কেঁপে ওঠে এ বঙ্গ আর ও বঙ্গের মানুষের। একদিকে খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর আর অন্যদিকে মসলন্দপুর, বসিরহাট, কুচবিহার—দেশভাগের জোয়ার মানুষকে এক পার থেকে অন্য পারে এনে ফেলেছে—এক দেশ থেকে অন্য দেশে। তবু স্মৃতিকে কি এত

সহজেই উপড়ে ফেলা যায়? অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সমীকরণ বাস্তবতা পেয়েছে বিশেষজ্ঞের বিচারে, সমালোচনায়। কিন্তু সাহিত্যের পথ এসব ধরে চলে না। সেখানে এক ভাষা-ভাষী মানুষের ভিন্ন দুই দেশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খুঁজতে থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে তার স্বপ্নের—কল্পনার সেই ঐক্যবদ্ধ দেশকে—আর অসহায়ভাবে খুঁজতে থাকে শিকড় থেকে উৎপাটন আর তার যন্ত্রণার কারণকে। দেশভাগ এর প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ট্রমা, অভিজ্ঞতা আর উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তবতাকে ভিত্তি করে আশি—নব্বই—এর দশক, এমনকি একবিংশ শতকেও রচিত হয়ে চলেছে বাঙালির সাহিত্য। দেশ-বিভাজনের পিছনের কূট রাজনৈতিক যুক্তি-তর্ক, ঐতিহাসিকতা আজও যেমন জোরালো তেমনি তার মানবিক চিহ্নগুলি নিয়ে আজও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন দুই বাংলা ও আর বাঙালির সাহিত্য। কখনো স্মৃতির সরণী ধরে ছিন্নমূল মানুষের ঘরে ফেরার স্বপ্ন-বাসনা, কখনও সব হারানোর বেদনা অথবা কখনও নবতর উপলব্ধির প্রেরণা তাকে চকিত করেছে—করেছে চঞ্চল। পার্টিশন ভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা নির্মিত হয়েছে এভাবেই।

উত্তর প্রজন্মের পার্টিশন ভাবনা দিয়ে শুরু অমর মিত্রের 'নদীর ওপার' গল্পটি। একদিকে ইছামতী নদীর পারে বসা ষাটোর্ধ্ব গনেশের চোখে অতীত দিনের স্বপ্ন বিভোরতা আর অন্যদিকে তার নব্বই বছরের পিতা অভয়পদর স্মৃতিপথে কালীপদ, নিরাপদ আর তাদের পরিবারেরা একে একে ভিড় জমায়। হারিয়ে যাওয়া ঐসব মানুষেরা যেন সুদূর অতীত থেকে ডাক দিয়ে যায় গনেশকে। গনেশ ইছামতীর কুয়াশাময় তীরে বসে স্বপ্নময় কল্পনার জগতে তাদের সাথে একা একা কথা বলে। গনেশের কাছে হারিয়ে যাওয়া পিতৃপুরুষের গ্রাম ধূলিহর আর ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কল্পজগতের পথ বেয়ে হাজির হয়। নীলাম্বর যখন দেশভাগের পর ওপার থেকে এপারে চলে এসেছিলেন তখন দাবার বোর্ডটাই শুধু আনতে পেরেছিলেন, ঘুঁটি পড়েছিল ধুরোলে। তার দাবার সঙ্গী অনন্ত ভদ্র কিন্তু চলে আসেন নি দেশ ছেড়ে, রয়ে গিয়েছিলেন ওপারেই। গনেশের স্বপ্ন আর কল্পনায় একে একে সিল্যুয়েটের মতো ভেসে উঠেছে নিরাপদ কাকার বিবাহ, কালীপদ আর শোভারানীর দাম্পত্য জীবন। ইছামতীর পারে, সেই অন্ধকারময় কুয়াশাচ্ছন্ন তীরে গনেশ তার অতীত পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হয়। কল্পনার সেই মিলনে আছে এক স্বপ্নময় আনন্দ, আসলে যা বাস্তবের ব্যথায় বিষণ্ন, বিধুর। গল্পের শেষে দেখি, ফেরার পথে বসিরহাটের ভূবন ঘোষের দোকান খুঁজে বের করে কাঁচাগোল্লা কেনে গনেশ আর বাড়ি ফিরে বাবা অভয়পদকে নিজের নতুন ব্যবসার কথা বলে সেই সন্দেশ খেতে দেয়। নব্বই পেরোনো অভয়পদ সন্তানের এহেন আচরণে মুগ্ধ হয়ে আবারও স্বপ্নময় কল্পনার জগতে ডুব দেন। সাতক্ষীরের স্মৃতিতে আকুল হয়ে অভয়পদ বলতে থাকেনঃ **"বেভুল হয়ে থাকলেই এ জীবন আরো মধুর হয়। এই যে হয়েছে।"**[২] গল্পের প্রথমে অভয়পদর ভ্রান্তকথন চিকিৎসার পরিভাষায় মানসিক রোগ লক্ষণের চিহ্ন বলে অভিহিত হলেও আসলে যে তা অভয়পদর অতীতের মাধুর্যময় দিনগুলির মানসিক পুনরুদ্রেক যা অবচেতনে অভয়পদকে অবিরত কোনো এক তৃপ্তি দিয়ে চলে—বাঁচার প্রেরণা জোগায় তা গল্প পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। অন্যদিকে অতীতের এই মধুর পুনরুদ্রেকের মধ্যেই বেঁচে থাকে হৃতসর্বস্ব বর্তমান—যা থেকে গনেশ অথবা অভয়পদদের আর হয়তো কিছুই পাবার নেই। গল্পটির উল্লেখযোগ্য দিক দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলার একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারের ঐক্যবদ্ধ পারিবারিক জীবনচিত্র। পারিবারিক ভাবে মিলের কারণে এখানে সবাই সবাই-য়ের কাছেই যে অতি আপন—গল্পের বিবরণেই তা বোঝা যায়। এই চিত্র আর বিশ্বাস যে ক্রমশঃ ভাঙতে বসেছে—আধুনিক সমাজও তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তদুপরি, গনেশের কল্পনার পাশাপাশি অভয়পদর তথাকথিত ভ্রান্তিময় উক্তিগুলি মিলে যেন দুই প্রজন্মকে পাশাপাশি দাঁড় করায়, তা দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দে বিভোর সেই মানুষগুলির কাছাকাছি পাঠকদের নিয়ে যায় যা একদিন সত্য ও সুন্দর ছিল—কিন্তু আজকের পটভূমিতে যা এক নিষ্ঠুর ভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে। এ গল্পে ইছামতী যেন পার্টিশন-পরবর্তী দুই বাংলার মাঝে এক বিভেদ অথবা স্পষ্ট বিভাজনরেখা হয়ে উঠেছে। পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ির খোঁজে পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকবন্ধুদের নিয়ে ভ্রমণযাত্রার বিবরণ মেলে লেখকের **'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে'**[৩]-র দ্বিতীয় অংশে।

বোঝা যায় স্বদেশ হারানো স্বজনকে খুঁজে ফেরা ও তাকে ফিরে না পাবার বেদনা লেখক অমর মিত্রের গল্পের এক অন্যতম চারিত্র লক্ষণ।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পার্টিশন ভাবনার অলৌকিক ভাববিন্দুতে পৌঁছানোর সাহস দেখিয়েছেন অমর মিত্র তাঁর '২৫-১২৫' গল্পে। এ গল্পের 'অন্তহীন আনন্দলাল' অন্তহীন আনন্দের স্রোতে ভাসতে যোগ দিয়েছে ফেসবুকে। আসলে আনন্দলাল তার নকল নাম। আনন্দলাল 'সুমিত বালা' বা 'চতুরানন মিশ্র' নামেও আই.ডি. তৈরী করে বন্ধুতা করে চলে নানা নারীর সাথে। এভাবেই কলকাতা আর রুক্ষ মাটির দেশ বিলাসপুরে কাটিয়ে আসা আনন্দলাল একসময় পরিচিত হয় বাংলাদেশের পটুয়াখালির আঁধারমানিক গাঙপারের আঁধারকুসুম গ্রামের বাসিন্দা রূপসী সোমা পারভিনের সঙ্গে। ধীরে ধীরে সোমা পারভিন বুঝতে পারে তার বন্ধু আনন্দলাল পুববাংলার সাতক্ষীরার লোক কারণ ওখানকার লোকেরাই পূর্ববঙ্গের ভাষায় বলে 'হাতনে', 'পৈঠা' আর 'পান্তা'। ক্রমশঃ পারভিনের সঙ্গে কথনসূত্রে এক অদ্ভুত ভার্চুয়াল জগতের অধিবাসী হয়ে প্রজন্মান্তরে পিছিয়ে আনন্দলাল পৌঁছে যায় তার পূর্বপুরুষদের দুনিয়ায়। পারভিন তাকে 'ধুলোর'-এর কথা বলেছিল। ধুরোলের সেনবাড়ি, সেনপুকুর, কাল ভৈরবের থান, বটের নীচে হাজরা ঠাকুর—এ সবেরই সে সন্ধান পায় পারভিনের কাছে। এসবই তার পাঁচ বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট অতীতের স্মৃতি। বুধাহাটা, বড়দল স্টীমারঘাটা, কপোতাক্ষ আর বেতনা নদীও সেই স্মৃতিহারে জড়িয়ে আছে। পারভিনের কথাসূত্রে সে জানতে পারে পারভিনের নব্বই বছরের ঠাকুরদা এজাহার শানার মনে আছে তাদের দেশে হিন্দুদের গাঁ-ঘর অন্ধকার হয়ে আছে কতকাল। পারভিন জানায়, সে তার ঠাকুরদাকে বলবে—সে পেয়েছে আনন্দের সন্ধান। আর সোমা পারভিনের কথায় 'অন্তহীন আনন্দলাল' ওরফে রতনলাল সেন খুঁজে পায় তার মা সুরমা সেনকে—সেই নতুন বৌ, যার নৌকা একদিন ভিড়েছিল কপোতাক্ষের বুক বেয়ে সুপুরিঘাটায়। ব্যালকনিতে বসে একা একা ভাবতে থাকে আনন্দলাল। তার ছোট্ট পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতি যেন ঢেউ হয়ে—চৈত্রের মত্ত বাতাস হয়ে হয়ে ঢুকে পড়ে ইলেকট্রনিক্সের সেই অন্তহীন ভার্চুয়াল দুনিয়ায়। সেখানে যেন সোমা পারভিনের বন্ধুতা চেয়ে অপেক্ষা করে আছে তার পিতৃকূল-মাতৃকূলের সব্বাই। সেখানে আনন্দলাল নিজে হয়ে যায় তার পিতামহ বিহারীলাল, এজাহার শানা একদিন ছিল যাঁর দাবার সঙ্গী। এদের সবাইকে পারভিনের বন্ধুতা এনে দেবে ভূবনগ্রামের 'স্যান'পুকুরের পুবের সেই হিমসাগর আমগাছটার কথা যেটা তার ঠাকুমার নিজের হাতে পোঁতা। ভূবনগ্রামের সেই কল্পলোকে একশো পঁচিশ বছরের বিহারীলাল অনায়াসে মিশে যান তাঁর থেকে একশো বছরের ছোট সোমার সাথে। এই বন্ধুত্বের জগতে, অপরিচিতের ভিড়ে পরিচিতের কালান্তরিক আত্ম-অনুসন্ধানে নেই কোনো পা-পিছলোনো হিন্দু-মুসলমানের গহন গিরিখাত। সেখান থেকেই গল্পে উঠে আসে পার্টিশন পরবর্তী কল্পবাস্তব এক প্রেক্ষাপট, জন্ম হয় এক নতুন আইডেন্টিটির—'ফেসবুক প্রোফাইল'-ই যার পরিচয় সর্বস্বতা নয়, দেশকালের এক বৃহৎ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে—এক মধুর, সুমহান ঐতিহ্য ও সম্পর্কের ইতিবৃত্তে বেঁচে থাকতে চায় যা।

এ গল্পে কল্পবাস্তবের সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ অনুষঙ্গেরও ব্যবহার করেন গল্পকথক। যখন বরিশালের বন্ধু সীমন্তিনী আনন্দলালকে জানায় তার 'প্রোফাইল ছবি'-র হলুদ পাখিটি হলো ও দেশের 'বসন্তবৌরি', যাকে একলা জামরুল গাছের ডালে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখে ক্যামেরা বন্দী করেছিল সে, তখন থেকেই যেন কল্পনার অনুরণনে কাঁপতে থাকে এ গল্প। এ গল্পে ভার্চুয়াল জগতের জলুস, বাসনা, প্রেম, নকল বন্ধুতা, গোপনীয়তা কিংবা গ্লানির বিশ্লেষণ আছে। গল্পের শেষে আনন্দলালের কাছে এই ভার্চুয়াল পৃথিবীটাই হয়ে যায় ভূবনগ্রাম—তার স্মৃতির ভূবন। সেখানে স্বপ্নরা, কল্পনারা অনায়াসে সত্যি হয়ে যায়—ঠিক যেমন করে সত্যি হয়ে যায় জয়শীলার 'কবুতরের মতো গ্রীবা বাঁকিয়ে' কথা বলা! এ গল্প ফেসবুক ছলে এক স্বজন সন্ধানীর বেদনাগাথা। সম্পর্ক সম্মীলনের এক মহা আবহে এ গল্পের বিস্তার। দুই অসমবয়সী নারী-পুরুষের কথন সূত্রে কমপিউটারের যান্ত্রিক দুনিয়ার আবরণ উন্মোচন করে এক মানবিক দুনিয়ায় প্রবেশ যেমন এ গল্পে স্মৃতি-সত্তা আর বাস্তব-কল্পনার পৃথক দুই ক্ষেত্রকে একাকার করে দিয়েছে তেমনই এই নতুন আঙ্গিক বাংলা গল্পে এক নতুন মাত্রাও সৃষ্টি করেছে।

'অলীক ক্রন্দনধ্বনি' গল্পটিতেও ভার্চুয়াল জগতের সাপেক্ষে দেশভাগের পরবর্তী অতীত মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ গল্পটিতে অঞ্জনকুমার বসু ছদ্মনামের প্রোফাইল ক্যারেকটার কমল ব্রহ্ম ফেসবুক মাধ্যমে যাদের সাথে মিলিত হয় তারা সকলেই নিজেদের অতীত সূত্রে গাঁথা পড়ে আছে। এ গল্পের সুদেষ্ণা চৌধুরীকে যেমন আজও কাতর করে একসময় স্বামী অঞ্জনকে ছেড়ে তৃণাঙ্কুরকে গ্রহণ করার ভুল, তেমনই রিনি বুশরার স্মৃতিতে জেগে থাকে তার নানি পদ্মাবতীর কথা—যে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তার এক ছেলে আর এক মেয়েকে হারিয়েছিল অঞ্জনদের দেশের রিফিউজি ক্যাম্পে। তার দাদু ইসলাম নিলেও নানি তা নিতে পারেন নি। তার বড়ো মাসি দীপালিও নেয় নি, আর তার দাদু ও তাঁর দুই মেয়ে ইসলাম নেয় 'আফটার দ্য লিবারেশন অফ বাংলাদেশ', তার মায়ের বয়স তখন দশ আর ছোটমাসির ছয়। রিনির কথায়ঃ **"আমরা মুসলমান, নানি সনাতন ধর্মে রয়েছে। মাসির বিয়ে হয়েছে মুন্সিগঞ্জে হিন্দু ঘরেই। নানি বলে কলেরায় তখন সে আর তার বাকি তিন মেয়ে মরে নি কেন, শুধু লোকটা বেঁচে থাকত।...নানা মরে গেছে তিনবছর আগে, তখন নানি তার শাঁখা ভেঙে সিঁদুর তুলে বিধবা হয়েছে, তার শ্রাদ্ধ করেছে বড়ো মাসির বাড়িতে, ইসলাম মতে আমরাও করেছি তার কাজ, কিন্তু নানি এখনও কাঁদে, তুমি কি বলবে?"**[৪] এ গল্প দেশভাগের বিশাল পটভূমিতে বিচ্ছেদ ও বেদনার এক মানবিক কাহিনী। এখানে রিনি বুশরা বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ খুলনা কলেজে পাঠরত তার একসময়ের প্রেমিক জালালের কাছ থেকে, পাকিস্তানি প্রেমিকা সোমায়া আখতার কামনাকাতর হয়েও বিচ্ছিন্ন আরসাদ আলি রূপ অঞ্জন বাসুর কাছ থেকে আর বিচ্ছিন্না ও অনুতপ্তা সুদেষ্ণা প্রায়শ্চিত্তকামী তার মৃত স্বামী অঞ্জনের কাছে। এক অদ্ভুত কল্পনার জগতে বিচরণ করে, ভাব বিনিময়ের মধ্যে, পরিচিতি অথবা অপরিচিতির আড়ালে থেকে তারা খুঁজতে চেয়েছে জীবনের স্বান্তনা। সব কল্পনাগুলো মিলে-মিশে যেমন সম্পর্ক জটিলতার এক কোলাজ-কাহিনী হয়ে ওঠে তেমনই ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের মতই কাটা-ছেঁড়া সুরে বাজতে থাকে সেই সম্পর্কের ছিন্ন তারগুলো। এ গল্প দেশভাগের মানবিক যন্ত্রনাগুলোকে তুলে ধরার সাথে সাথে মানবিক সম্পর্কের অযাচিত ফাটলগুলিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

'সৌদামিনী ও সুরদাস' গল্পেও ফেসবুক সূত্রে সুন্দরী নাতনি রূপসার ফ্যান্টাসির জগৎ তার পঁচাশি বছরের ঠাম্মা সৌদামিনীর দেশভাগপূর্ব অতীত জীবনের অকথিত প্রেমের রহস্যময় পুনরাবিষ্কারে সন্ধানী হয়েছে। কলকাতার টালার বাসিন্দা রূপসা এসেছে বিথারিতে তার ঠাম্মি সৌদামিনীর কাছে। সঙ্গে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ল্যাপটপ, মোবাইল। পরিবারের সকলের আদরের আহ্লাদী মেয়ে সে। প্রায়ই বিদ্যুৎ না থাকা বিথারিকে তার জীবনের একটা চেঞ্জ বলে মনে হয়। বিথারি—নবগ্রাম, এর নৌকা বাঁধা ঘাট, পানা আর শ্যাওলা ধরা শীর্ণ ইছামতী, বনঝোপ, মেটে রাস্তা, সাঁকোর উপর বড় ঠাকুর্দ্দার কল্পনার প্রতিচ্ছবি একটা নতুন জগতের হাতছানি দেয় তাকে। সে যেন হারিয়ে যাওয়া এক অতীত দুনিয়া। এ যুগের আধুনিকা রূপসা তার ঠাম্মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। নতুন প্রজন্ম রূপসার আছে ই-মেল আর ইন্টারনেটের রঙিন পৃথিবী। রহস্যময় সেই আন্তঃর্জাল মহাবিশ্বে রূপসা আবিস্কার করে তার পঁচানব্বই বছরের ফেসবুক সঙ্গী সুরদাসকে। রূপসার রূপে উন্মাদ সে। ঠাম্মাকে দেখাতে চায় সে তার প্রেমিক সুরদাসকে। গল্পে দেখি এরপরই ক্রমশঃ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের সুরদাস ১৪১৯-এর রূপসার সাথে ফেসবুক মেসেজ বক্সে বার্তার লেনদেনে অনায়াসে মিশে যায়। সৌদামিনীর চোখে নাতনীর এই উন্মাদ বন্ধুটিকে বড় চেনা বলে মনে হয়। সে যেন সৌদামিনীর হারিয়ে যাওয়া যৌবনকালের সেই হরি সেন যে বন্ধু বিনায়কের সাথে পাত্রী দেখতে এসে একদিন নিজেই পছন্দ করে বসেছিল সৌদামিনীকে। সৌদামিনীর রূপে উন্মাদ ছিল হরি সেন। বিনায়ক বোসের সাথে বিয়ে হয়ে যায় সৌদামিনীর আর তারপর রটে যায় কোনো এক জোছনা রাতে কামালের বিলে পরী দেখতে নেমে পাগল হয়ে গেছে হরি সেন। অনেকে বলে বোসবাড়ী থেকে আলোকলতার রস খাইয়ে পাগল করে দেওয়া হয়েছিল তাকে। রায়টের সময় যখন আসেনি তখনই সৌদামিনী সহ তার শ্বশুরবাড়ির সবাই সাতপুরুষের বাস তুলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছিল এপারে। আসেনি শুধু হরি সেন। সে তখন বদ্ধ উন্মাদ, রূপসা পার হয়ে সৌদামিনীর বাপের বাড়ি গাঙপুরের হাটে হাটে সে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই হরি সেনই যেন এতদিন পর সৌদামিনীর মতই রূপসী রূপসার ল্যাপটপে তার ফেসবুক বন্ধু হয়ে ফিরে এসেছে। এখন সে থাকে এক মস্ত কোঠাবাড়ির ভগ্ন গৃহে—কতদিনকার পুরনো, ধসে পড়া দালানের এক জীর্ণ কক্ষে। এ গল্পে রূপসা শুধু এক মেয়েই নয়, রূপসা নদী—রূপসা যেন বান, সে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক যুগ থেকে অন্য যুগে। গল্পের রূপসার কাছে ঋতু যখন বৈশাখ সুরদাসের কালের আকাশে তখন আষাঢ়ের ভরা বর্ষা—বিদ্যুতে বিদ্যুতে মেঘের ঘনঘটা। ব্রহ্মরাজপুরের সেই উন্মাদ হরি সেনের সাথে সুরদাসের মিল খুঁজে পায় সৌদামিনী। বিস্মিত, অভিভূত হয়ে ওঠে সে। ফেলে আসা জীবনের গোপন প্রেমিক সূত্রে দেশভাগপূর্ব অতীত ছায়া মেলে সৌদামিনীর চোখে। এ গল্পেও কল্পনার সময়-মেসিনে চড়ে গল্পকার পাড়ি দিয়েছেন অতীতের বাংলায়, সেখানে পরীদের দুনিয়ার মতোই স্বপ্নেরা ডানা মেলেছে। ভার্চুয়াল জগতের মায়া আর বাস্তব জীবনের মোহ, হাসি-কান্না এক হয়ে গেছে। ফেসবুকের অলীক দুনিয়া কল্পনা আর ছেড়ে আসা বাস্তব পরস্পর হাতে হাত মিলিয়েছে। লেখকের ভাষায় সৌদামিনীর অপরূপ সে মনের কথাঃ **"বলতে পারো, আগের দিনে অমনি হতো.....বিনিবিন করে কথাটা বলল সৌদামিনী, চাঁদের আলো, এই রাত্রি, দূর আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে। কী করে যে বহু যুগের ওপার হতে লোকটা ভেসে এল আচমকা! হাসিখুশি মেয়েটির টান এমন! কেউ কেউ বলে রূপসা তার মতো হয়েছে, তার রূপ পেয়েছে মেয়ে। রূপসা এলে তাহলে এমন হয়! ও হাসতে হাসতে নিয়ে আসতে পারে, ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের আগের পৃথিবী আর মানুষ। সেই মানুষ যে ভেঙে-পড়া কোঠাবাড়ির ভেতরে বসে ডাক দিয়ে দিয়ে একাল সেকালে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিয়ে আসতে পারে...শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী...ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী... সুহাসিনী... সুমধুরভাসিনীর মুখ। নানা রঙের দিনগুলি।"**[৫] এ গল্পে কাল থেকে কালান্তরে বয়ে চলা উন্মাদের দিনলিপির পথ ধরে কল্পনার অন্ধকবি সুরদাস সহসাই হয়ে উঠেছে বাস্তবের হরি সেন আর চাঁদের আলোর রং বাতাসে মুছে নিয়ে পঁচাশি পার করা বৃদ্ধা আর বাইশ বছরের রূপসা অনায়াসে এক হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম শ্লোকের প্রয়োগও হারানো বাংলা আর হারানো মানুষের অনুসন্ধানে সাযুজ্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

'হোসেন মিঞার নাও' গল্পেও ছড়িয়ে আছে দেশভাগজনিত বিচ্ছিন্নতার অলীক পর্ণরেণু। চট্টগ্রাম জেলার ময়নাদ্বীপকে মানিকের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিঞার দ্বীপের সাথে তুলনা যেমন অভিনব তেমনই দুরদ্বীপবাসিনী চম্পার সুমেরুকে লেখা চিঠিতে ভালোবাসার সাথে সাথে দূর ও বিচ্ছিন্ন জীবনের জন্য বেদনার হাহাকারও ধ্বনিত হয়েছে। এ বেদনা ওপার বাংলার পাঠিকার তার প্রিয়তম এপার বাংলার লেখককে দেখতে না পাবার বেদনা। দেশ বিভাজনের সূত্র ধরেই সেই মৌল বিচ্ছেদের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের রোমান্টিক বর্ণনাময় আবহে। সুমেরুর 'সমুদ্রমঙ্গল' পড়ে চম্পার অনুভূতি লেখকের ভাষায়ঃ **"প্রিয় লেখক সুমেরু, তুমি যে দ্বীপের মেয়ের কথা লিখেছ তাকে তুমি কোথায় পেলে গো? হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে। হ্যাঁ, আমিও খুব বই পড়তে ভালোবাসি। কত বই। এ পারের বই, ওপারের বই। ওই যে মারা গেলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর কবিতা আমার খুব প্রিয়। তিনি যেন আমাকে নিয়েই লিখেছিলেন নীরার কথা,**

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে...

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে একা বসে আমি আমার কবির কথা ভাবি যে। আমার যে নিজস্ব এক কবি আছেন। স্বামী জানতেও পারেন না আমি আর এক পুরুষের কথা ভাবছি। আচ্ছা, আমি আমার দুই প্রিয় লেখকের কথা বলছি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তাঁরা কেমন আছেন গো? সিরাজ সাহেবের একটি গল্প পড়েছিলাম, সূরজমুখী, সে যেন আমার গল্প গো। আমিই ছিলাম ওই মেয়ে। কাপুড়ের সঙ্গে আমিই চলেছিলাম। মনে পড়ে সেই কথা,

ধুলাউড়ির মাঠেরে ভাই
রোদ ঝনঝন করে।
পানের সখার সঙ্গে দেখা
বেলা দুপহরে।।"[৬]

ওপার বাংলার সিরাজ আর এপারের লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর সাথে আত্মিক যোগ ঘটেছে দূর দ্বীপবাসিনী কণ্যার। 'শ্যামলবাবুর' 'তেওট তালে কনসার্ট' গল্পের মেয়েটির মতো নিজেকে সে কল্পনা করে। কল্পনার রং-এ ময়নাদ্বীপে সংসার পাতা হাতিয়ার মেয়ে গৌরনদীর মেয়ে হয়ে যায়। চিঠি আর পত্রমিতালীর সূত্র ধরে কখনও এপার বাংলার সুমেরু আবার কখনও ওপার বাংলার সুমন্ত রাহমানের কাছে মেয়েটি পদ্মপাপড়ির মতো তার হৃদয় মেলে ধরেছে। সেখানে কখনও কামনার রক্তরাগের ছিটে আবার কখনও বা সাহিত্যধর্মী কল্পনার রূপে-রং-এ আনন্দ-বিরহের ছোঁয়া লেগেছে, কবিতা থেকে কথাসাহিত্য—শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা শামসুর রহমান থেকে অদ্বৈতর তিতাস কিংবা ইলিয়াসের খোয়াবনামায় যার অবাধ চলাচল। তবু বিচ্ছিন্নতার বেদনাই এ গল্পের শেষ সত্য—চিঠির কল্পনায় অদর্শনের সেই ব্যথা বঙ্গতনয়া চম্পার মনে সপ্তরাগে বেজে ওঠে। লেখকের ভাষায়ঃ **"অদ্বৈত, ওয়ালিউল্লাহ, শ্যামল, সিরাজ, সুনীল, শক্তি, শামসুর, ইলিয়াস...একবার দেখি তোমাদের। সুমন্ত রাহমান, বড়ো সাধ জাগে, একবার তোমায় দেখি। কবির চিঠিগুলি সব আমার কাছে লুকনো আছে। হোসেন মিঞা জানতে পারলে আমি শেষ হয়ে যাব, তার নাও, এই ময়নাদ্বীপ ভাসিয়ে এমন কোথাও নিয়ে যাবে, যেখানে ডাকঘর নেই। ভাঙন ধরা দ্বীপে তার অনুমতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমায়।"**[৭] এ গল্পের উনপঞ্চাশ বছরের পাক ধরা চুলের সুমেরুর কাছে ময়নাদ্বীপবাসিনী চম্পা আখতারের চিঠির আঙ্গিকে এভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেশভাগ পরবর্তী জীবনের স্বপ্ন ও যন্ত্রনা।

ফেসবুক এর কথা এসেছে 'সাঁকোবাড়ি' গল্পেও। আমিরুল বাশার-এর ফেসবুক ফ্রেন্ড হলেন বিমলেশ। তাঁর দাদা খায়রুল বাশার যাচ্ছেন কলকাতার নন্দনে বাংলাদেশ বইমেলায়। আমিরুল বিমলেশকে মেসেজ করেন তাঁর দাদার সাথে পরিচিত হবার জন্য, কারণ বিমলেশের মতো তিনিও সাতক্ষীরের লোক। বিমলেশদের আদি বাড়ি ছিল সাতক্ষীরের নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। কিন্তু সাতক্ষীরে তার কছে ভেনিস, প্যারী, লন্ডন কিম্বা আইফেল টাওয়ারের থেকেও বেশি অচেনা। অবশেষে বিমলেশ পরিচিত হয় খায়রুলের সাথে। কথায় কথায় উঠে আসে ধুরোল গ্রাম, কপোতাক্ষ নদ আর প্রকাশের কথা। প্রকাশ বিমলেশের মেসো পশুপতি ঘোষের ছেলে, খায়রুলের বাল্যবন্ধু। একসময় সাতক্ষীরেতে ফুলের চাষ আর বাগান ছিল প্রকাশের। তারা একসাথে ও দেশের ঢাকার বুকে নাটক করতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আকবর মোল্লা প্রকাশের গোলাপ আর রজনীগন্ধার বাগান তছনছ করে। তারপর বাগানের সেই জমি আকবরের কাছেই নামমাত্র দামে বিক্রি করে প্রকাশ চলে আসে এপার বাংলায়। অমলেশ জানতো দেশভাগের পর প্রকাশ ওপার বাংলা থেকে চলে এসেছে এপারের বারাসাতে। কিন্তু সেখানেও খোঁজ মেলে না প্রকাশের। অথচ খায়রুলের জমাট বুকে আজও রয়ে গেছে প্রকাশকে ফিরে দেখার সে অকাতর বাসনা, গল্পকারের ভাষায় যা—**"প্রকাশেরে খুব দেখতি ইচ্ছা করে, তার সেই রজনীগন্ধা বাগানের ধারে বসে কবিতা পড়া, আহা....."**[৮] এক সাংস্কৃতিকতার সূত্রে বেঁচে আছে এ গল্পে ভিন্ন ধর্মের দুই মানুষের সম্পর্ক। দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা—কিন্তু বাল্য বন্ধুত্ব, বাঙালীত্ব আর সংস্কৃতির টান যে সম্পর্কের লালন করেছে তা থেকে তাদের পৃথক করবে কে? তাই সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা দেশভাগের এতদিন পরও কাতর করে উত্তর প্রজন্মের এক মুসলমান প্রৌঢ়কে। গল্পের নাম সাঁকোবাড়ি। গল্পের একদম শেষে গল্পকার এ নামেরও এক অর্থবোধক ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরেন। লেখকের ভাষায়ঃ **"বিমলেশের কানের কাছে সমস্ত রাত ধরে খায়রুল বাশারের কণ্ঠস্বর ভেসে থাকল। গাঙে আর পানি নেই, কিন্তু সাঁকোবাড়ি আছে। সেই সাঁকো পেরিয়েই বোধহয় সাতক্ষীরে যাওয়ার পথ। আসেন দাদা, সাঁকোটা বাঁধসি গাঙের উপর। গাঙটা ধরে রেখেছে খায়রুল বাশার তার বুকের ভিতর। বুকের নদীতে সাঁকো। তারপরে সাতক্ষীরে। তারপরে সেই বাড়ি। ফুলের বাগান।"**[৯] আশ্চর্য এক স্বপ্ন-কল্পনা। ভারত-বাংলাদেশের ভৌগোলিক

বিভাজন আজকের শুকনো বেতনার মতো শুকনো বুকের খাত জুড়ে যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে—খায়রুলের অন্তরে তৈরী সাঁকোবাড়ি তাকে আবার যোগ করে দেবে। আবারও সেই সাঁকোবাড়ির বুক ধরে পৌঁছে যাওয়া যাবে স্বপ্নের সাতক্ষীরে আর স্বপ্নের সেই ফুলের বাগানে। এ যেন মানুষী হৃদয়ের সেই আশা আর ভালোবাসার উপবন যার বুক থেকে ছিন্ন হবার যন্ত্রনা যেমন মর্মন্তুদ তেমনই তাকে ফিরে পাওয়ার অমর বাসনা জেগে থাকে সাকোবাড়ির প্রতীকায়িত রূপচিহ্নে।

'বনহংসীর দেশ' এক অদ্ভুত প্রত্যাবর্তনের গল্প। গল্পটি লেখকের অন্যান্য গল্প থেকে আলাদা কারণ এখানে উত্তর প্রজন্মের চোখে প্রত্যাবর্তনের পুরোটাই প্রায় বাস্তব—গল্পের শেষ দৃশ্যে একমাত্র বনহংসীর রূপক ছাড়া কল্পনার মোহাঞ্জন সেখানে অন্যান্য গল্পের মতো বিষয়বস্তুকে পুরোপুরি আবিষ্ট করে নি। এ গল্পে উত্তর প্রজন্মের দুই চরিত্র হলো মাজারুল ও সুলেখা। সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার বরাত পেয়েছেন কন্ট্রাক্টর জীবনবাবু। আর তাঁরই সাহায্যে বালুরঘাটের বর্ডার দেখার সুযোগ পেয়েছে সুবীর ও অলকা। ভারত আর বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ প্রান্ত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঁটাতারের বেড়া কিভাবে একই ভাষাভাষির মানুষদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে দেয় তা রহস্যময়ভাবে এক মানতে না চাওয়া প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠেছে অলকার কাছে, আর গল্পে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বর্ডার পারের হাট-বাজার, অবৈধ অনুপ্রবেশ আর বেচা-কেনার ছোট-বড় নানা ঘটনা নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়া পরিচিত মাটি আর মানুষকে কি অদ্ভুতভাবে আলাদা করে দিয়ে শুধুই স্পষ্ট করে তোলে এক আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা—যার মুদ্রা, পতাকা অথবা ন্যাশনালিটি আলাদা, পঁচিশ বছর আগেও যা ছিল এক। কাঁটাতারের ঐ বেড়া এ গল্পে ইতিহাসের ট্রাজিক পরিণতির সাক্ষর—যার ওপারে পড়ে আছে মাজারুলের মৃত অতীত। পার্টিশনের আগের দিনের স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর মাজারুলের মনে এখনও ঘোরাফেরা করে বগুড়া শহর, তার রূপবতী বড়ো পিসি আর তার ছেলে শহীদুল ইসলাম। অমল ভট্টাচার্যের মুখে বড়োপিসির পরিবারের পরিণতি শুনতে শুনতে মাজারুলের চেপে ধরা হাতের মুঠিতে বসে যায় কাঁটাতার, রক্তাক্ত হয় সে। এ গল্পে সীমান্তপারের জীবন অভিজ্ঞতার বাস্তব রূপায়ন আছে। ওপারের গরীব মিঠাই বিক্রেতার চিনির ঢেলা নামক বস্তুকে 'মিঠাই' নামক 'ফরেন জিনিস' বলে বেশি দামে বিক্রি করে অলকার হাতে তুলে দেওয়া, সীমান্তবর্তী হিলিবাজার আর রেললাইন বরাবর হল্লা—উল্লাস, ফড়ে-দালাল-সীমান্তরক্ষী, হরলিকস্, ভিকস্ আর ফেনসিডিল সিরাপের বিকিকিনি, পার্বতীপুর থেকে জানালা, দরজা, ইঞ্জিনে ঝুলন্ত মানুষ নিয়ে হিলি স্টেশনে আসা হলুদ রেলগাড়ি—যার গায়ে লেখা 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' প্রভৃতি নতুন বর্ডার দেখার এক অন্য আনন্দ আর উদ্দীপনা নিয়ে গল্পে হাজির হয়। কিন্তু এহ বাহ্য! গল্পের শেষ সত্যটি এদের সবকিছুকেই ছাপিয়ে যায়। এর আগে জেনেছি, উত্তর প্রজন্মের অলকার চোখে বর্ডার কখনও নিরর্থক আবার কখনো বা নিছকই আত্মপ্রবঞ্চনা। পার্টিশনের প্রত্যক্ষ স্মৃতিহীন অলকাও একসময় তার মাজারুলদার শিকড় বিচ্ছিন্নতার রক্তাক্ত অনুভূতি বুকে নিয়েই নিজের অদেখা পূর্বপুরুষদের প্রতি এক অজানা আত্মীয়তার টান অনুভব করে। গল্পকারের ভাষায়ঃ **"সেদিন রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে, আচমকা জেগে উঠল অলকা। সুবীরের পাশ থেকে নেমে যায়। দরজা খোলে। বারান্দা দিয়ে ছাদের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে। কাল রাতে যে হাঁস দেখতে পায় নি সে, আজ দেখবে। দূর পশ্চিমে সরু একফালি চাঁদ আকাশে ঝুলে আছে। তারায় তারায় ঝলমল করছে ব্রহ্মান্ড। অলকা আকাশে তাকিয়ে থাকল। আকাশের অনন্ত অসীমে তাকিয়ে অলকা ছোটো হতে আরম্ভ করল। আজ সে দেখবেই হাঁস। কেমন সে বনহংসীর দল? একঝাঁক যুদ্ধবিমানের মতো, নাকি আকাশে ভেসে যাওয়া পালক মেঘের মতো? সেই যে রূপবতী বনহংসীর দল, পরম রূপবতী বনহংসী, দূর উত্তর-পশ্চিমে উড়ে চলেছিল, তারা কোথায়? নিঃসঙ্গ হংসীটিও কি দেখা যাবে না আবার, শুধু যাওয়া আর আসা। কাল গেছে, আবার ফিরবে, আবার যাবে। আকাশের সবকটি তারা যেন দীপ্তিময় চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছে মাটির পৃথিবীতে। চোখে চোখ মিলল অলকার। অলকা দেখছিল ফুলপিসি, ছোটোপিসি—আকাশ ব্যাপ্ত রূপ নিয়ে তাকিয়ে আছে এই বিন্দুতে। তার সজল চোখের তারায়। এখানে মাজারুলের আসার কথা। অলকা ডাকল। মাজারুলদা আসবেন, আপনারা আকাশে থাকুন, মাজারুলদা আসছে।"**[১০] অলকার কল্পনায় বনহংসীর রূপকল্পে অনেকগুলি চিত্রকল্প ধরা পড়েছে।

একদিকে—'একঝাঁক যুদ্ধবিমানের মতো, নাকি আকাশে ভেসে যাওয়া পালক মেঘের মতো?' পরস্পর এই বাইনারি দেশভাগ পূর্ব স্বপ্নময় অতীত আর কঠিন বাস্তবের সচেতনতা জাগায়—অন্যদিকে 'পরম রূপবতী বনহংসী' যেন মনের অধিতলে মাজারুলদার পরম রূপবতী বড়ো পিসির চিত্রকল্প হয়ে ধরা পড়ে। সব মিলিয়ে কল্পনার সেই 'বনহংসীর দেশ' বাংলাদেশ আর তার তারায় তারায় ভরা উজ্জ্বল আকাশ যেন অতীতের স্মৃতি আর সত্তা হয়ে অলকার সজল চোখের তারায় ফিরে এসেছে—এক সরল রৈখিক দীপ্তি নিয়ে। সেইসব মানুষদের কেউ আজ আর পৃথিবীতে নেই, তবুও তাদের বনহংসীর মতো চলে যাওয়া অথবা আকাশ ব্যাপ্ত রূপ নিয়ে মাটির পৃথিবী পানে তাকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে যেন অলকা উপলব্ধি করেছে এক অনন্ত অপেক্ষার অনুসন্ধান। যে স্বপ্ন-সম্পর্কের সাধ অধরা রয়ে গেছে মাজারুলের জীবনে, যে বিচ্ছিন্নতার বোধ বিপন্ন করেছে অলকাকে—ঐ বনহংসীর ডানা মেলা আকাশের বুক জুড়ে থাকা ঐ মৃতেরা, ঐ অতীত সত্তাগুলোই হয়তো সেই সব অসম্পূর্ণতার ব্যথাভার মুছে দেবে একদিন—লৌকিক জীবনে না হলেও, কোনো এক মৃত, অলৌকিক জগতের ছোঁয়ায়, তার জাদুকাঠিতে। দেশভাগের সর্বাঙ্গীন ক্ষয়, প্রবঞ্চনা আর দীর্ণতা যেমন এ গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাস্তবের কাঁটাতারময় ভৌগোলিক বিভাজনে, তেমনই সীমান্তপারের আকাশ আর বনহংসীর কল্পনা সেই বিভাজনরেখাকেই রামধনুর মতোই ছদ্ম আর অস্পষ্ট করে দিয়েছে পর্যটক অলকার চোখে। চক্রাকারে বনহংসীর অবাধ গমনাগমন গল্পে এমনই এক অতিলৌকিক কল্পলোকের উন্মোচন ঘটিয়েছে যা মৃত পূর্বপুরুষদের অবিভক্ত দেশের কল্পনার রং-এর সাথে মিলে মিশে যায়, কোনো রাষ্ট্রীয় পার্থক্যের সীমানা চিহ্ন দিয়েই যাকে কখনও একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় না।

'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পে ছিটমহলের ঐতিহাসিক পশ্চাদপটকে পটভূমি হিসাবে রেখে দেশভাগ পরবর্তী জীবনে নিজ ভূমে পরবাসী শরণার্থী মানুষের হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব আর প্রকৃত নাগরিকত্বকে প্রশ্নচিহ্নের ন্যায় তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক মতে '**ছিটমহল**' বলতে এমন অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে বোঝায় যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অন্য রাষ্ট্রের এ ধরণের ছিটমহল রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান (১৯৫৫-১৯৭১) ও বর্তমান বাংলাদেশ একসময় ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের একটি ছিটমহল হিসাবেই পরিগণিত ছিল, যার রাজধানী ছিল ইসলামাবাদ। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানকে এর মূল ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ১৮০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বিদেশী অঞ্চল দ্বারা পৃথক ছিল এবং সে কারণে দেশের ৭০ শতাংশ রপ্তানি পূর্ব পাকিস্তান থেকেই করা হতো। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতালাভের পর পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করলেও ছিটমহল সমস্যা মেটেনি। তখনও বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের এবং ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের যে ছোট ছোট ভূখন্ডগুলি ছিল সেগুলোই ছিল ছিটমহল। নিজ দেশের মানচিত্রের বাইরে এদের বাস। ১৬২ টি ছিটমহল ছিল দুই প্রতিবেশী দেশে। এর মধ্যে ভারতের ১১১টি ছিটমহল ছিল বাংলাদেশের চারটি জেলার অভ্যন্তরে। আর বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল ভারতের অভ্যন্তরে। এসব ছিটমহলে বসবাসকারী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫১ হাজার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহলে বসবাসরত লোকসংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের লোকসংখ্যা ছিল ১৪ হাজার। ২৪ হাজার ২৬৮ একর ভূমি নিয়ে দুই দেশের ছিটমহল ছিল। তার মধ্যে ভারতের জমির পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ১৫৮ একর। বাংলাদেশের ছিটমহলের জমির পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ১১০ একর। ভারতীয় ছিটমহলগুলোর অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এসবের মধ্যে লালমণিরহাটে ৫৯ টি, পঞ্চগড়ে ৩৬ টি, কুড়িগ্রামে ১২ টি ও নীলফামারিতে ৪ টি ভারতীয় ছিটমহল ছিল। অপরদিকে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের অবস্থান ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। এর মধ্যে ৪৭টি কুচবিহার ও ৪ টি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত ছিল। তিন বিঘা করিডরও ছিল এর অন্যতম ছিটমহল। বাংলাদেশের লালমণিরহাটে ছিল সর্বোচ্চ ৫৯টি। পাটগ্রাম উপজেলায় ছিল ৫৫টি। পাটগ্রামের মানচিত্র বলতে গেলে ছিটমহলে ছিটমহলে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে ছিল। বাকি চারটি ছিটমহলের দু'টো করে ছিল হাতীবান্ধা আর সদর উপজেলায়। পাটগ্রামে অর্ধশত ছিটমহল থাকলেও

১৮টিতে জনবসতি ছিল। বাকিগুলো হয় ধানি জমি ছিল না হয় ছিল পতিত বনজঙ্গল। এর বাইরে পঞ্চগড়ে ছিল ৩৬টি ছিটমহল। কুড়িগ্রাম এবং নীলফামারীতেও ছিল ১২টি ও ৪টি ছিটমহল। ভারতের দিক থেকে বিবেচনা করলে এর সবই এককালে ছিল কুচবিহার জেলার অন্তর্গত। আর প্রশাসনিকভাবে তা ছিল লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায়। এর ৩৩টি ছিল লালমণিরহাটে আর কুড়িগ্রামের আওতায় ছিল ১৮টি, যার কোনোটির সঙ্গেই বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো যোগাযোগ ছিলনা।

ঐতিহাসিক মতে আরোও জানা যায়, কুচবিহার রাজ্যের কোচ রাজার জমিদারির কিছু অংশ রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন থানা যথা পঞ্চগড়, ডিমলা, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট, ফুলবাড়ী ও ভুরুঙ্গামারিতে অবস্থিত ছিল। '৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর ওই আট থানা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর কুচবিহার একীভূত হয় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। ফলে ভারতের কিছু ভূখণ্ড আসে বাংলাদেশের কাছে। আর বাংলাদেশের কিছু ভূখণ্ড যায় ভারতে। এতে এক অসহনীয় মানবিক সমস্যার উদ্ভব হয়। মূল ভূখন্ড থেকে ছিটকে পড়া এলাকাগুলোর মাঝে যারা বাংলাদেশের আছেন তারা তাও খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। কিন্তু ওপারের ছিটমহলবাসীদের ছিল একেবারে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। পরিচয় না পেলেও এপারের লোকেরা তাও বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে ঢুকতে পারতেন। পণ্যের বেচাকেনাও করতে পারতেন। কিন্তু ওপারের বাংলাদেশী ছিটমহলের লোকেরা একেবারেই প্রায় খাঁচাবন্দি ছিলেন। ভারতীয় ছিটমহলে থেকেও যে সকল ছিটের মানুষ বাংলাদেশের স্কুল কলেজে পড়ালেখা করতো তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু তথ্য লুকোতে হতো। প্রত্যেককেই প্রায় বাংলাদেশের ঠিকানা লিখতে হতো। কারণ ভারতীয় ছিটমহলের ঠিকানায় ভর্তি নিতো না স্কুল। শিক্ষার কাছে পিতৃত্বের পরিচয় গৌন হয়ে যেতো। একসময় হয় নাগরিকত্ব না হয় মৃত্যু এমন দাবীতে ছিটমহল বাসীদের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। ছিটমহল ছিল ভারত বিভক্তির এক জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্ন। অসংখ্য মানুষকে তা নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছিল। নাগরিক অধিকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত এই হিন্দু-মুসলমান মানুষগুলো তাদের জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে বছরের পর বছর আন্দোলন করেছে। তাদের বঞ্চনা-অসহায়তা উপলব্ধি করেই বঙ্গবন্ধু ছিটমহল বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। কিন্তু ১৫-ই আগস্টের নৃশংস মুজীব হত্যার পর তা আর কার্যকর হয়নি। ২০১৫ সলের ১ আগষ্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ আবারও একবার ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে।

২০১৫ সালে কলকাতার রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে আয়োজিত বাংলাদেশ বইমেলায় সাংবাদিক রক্তিম দাশের 'সাংবাদিকের কলমে ছিটমহল আন্দোলন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সীমান্ত গান্ধীর প্রপৌত্রী ইয়াসমিন নিগার খান, কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র, ছিটমহল আন্দোলনের শীর্ষ নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আব্রাহাম লিংকন, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গনি ও লেখক রক্তিম দাশ। বইটি ছিল ছিটমহল আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দলিল। এ সভায় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রও ছিটমহল নিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার কথা জানান। বলাইবাহুল্য, পার্টিশনের অমানবিক ধ্বস্ততা আজও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে ছিটমহল। স্বাধীনতা ও দেশভাগ পরবর্তী জীবনে সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম' কিংবা অমর মিত্রেরই 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' উপন্যাস ছাড়া ছিটমহলের অদ্ভুত জনজীবন নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য নীরবই থেকেছে।

অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পে উল্লেখিত ইতিহাসের কিছু সাহিত্যধর্মী বর্ণনা আছে। বলাইবাহুল্য সাহিত্য হয়ে উঠবার জন্য তাতে কল্পনার কিছু রং মিশেছে। এ গল্পে মোগল প্রতিনিধি রংপুরের ঘোড়াঘাটার নবাব সৌলৎ জং এবং কোচবিহারের মহামান্য নৃপতি উপেন্দ্রনারায়ণের লড়াই-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ঝাড় সিংহেশ্বরের যুদ্ধের পরেও তাদের সে বিবাদ মেটে নি। পত্রলেখক মশালডাঙা, মুন্সিরহাট, গয়াবাড়ি, বাতৃছিট ছিটমহলের নাগরিকবৃন্দের মুখপত্র স্বরূপ কোচবিহারের জেলাশাসককে লেখা নিবেদনপত্রে জানায়ঃ **"আমাদের পূর্বপুরুষ মোগল সৈন্য ছিল কি**

না জানা নাই, কিন্তু কৃষিই ছিল তাঁহাদের মূল জীবিকা তা আমাদের অবগত। স্বাধীনতার পর রংপুরের নবাব যেহেতু পাকিস্তানে মতদান করেন, সেই কারণে ভারতে থাকিয়াও আমরা পাকিস্তানি হইয়া গেলাম। ইহাতে আমাদিগের দোষ কি? আমাদিগের কাহারও কাহারও নিকট রংপুরের নবাবের প্রজা হিসাবে খাজনার রসিদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা স্বাধীনতার আগের কথা। স্বাধীনতার পর আমরা আর খাজনা দিই না রংপুরে গিয়া। আমরা কোচবিহার রাজাকেও খাজনা দিতে পারি না, কেন না রাজার প্রজার তালিকা হইতে আমরা বাদ ছিলাম সত্য।"[১১] এ গল্পে কোচবিহারের রাজা ও রংপুর নবাবের নিজেদের মৌজা বাজি রেখে অদ্ভুত দ্যুতক্রীড়ার বর্ণনা আছে। পারস্পরিক বাজিধৃত মৌজা জয়ের আনন্দে আকাশে ছোঁড়া গুলি ও কামানের গোলার আঘাতে নাকি একসময় মশালডাঙা সহ বিভিন্ন মৌজার নীলাকাশ ফেটে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি নেমেছিল আর বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুর পাশাপাশি শীতের তামাক ও সরিষার ক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ প্রবাদের সত্যতার থেকেও বড় কথা হলো, এ থেকেই বংশ পরম্পরাক্রমে সাধারণ প্রজার পরবর্তী ভাগ্যনির্দ্ধারণের পথ শুরু হয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী ছিটমহল অধিবাসীবৃন্দের উচ্ছিন্ন আর উদ্বাস্তু জীবনের নিদারুণ অধ্যায়ই তার স্মৃতিসাক্ষর। নাগরিকত্বের পরিচিতি বিভাজন আর রাষ্ট্রীয়নীতির বাধ্যবাধকতা কিভাবে এক মানবতাবিরোধী কূটনৈতিক মতপার্থক্য তৈরী করে তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে একটি ধর্ষণের ঘটনায়। গল্পে দেখি, ভারত না বাংলাদেশ এই দায়িত্বের জটিলতায় বাংলাদেশের ছিটমহলে ভারতের ধর্ষিতা ও মৃতা কন্যার পিতা নীলকণ্ঠ আধিয়ার সুবিচার পায় না। ছিটমহলের মাটিতে পড়ে পড়ে তার মেয়ের লাশ পচে যায়। অন্যদিকে অন্য ছিটের বাসিন্দা হওয়ায় ধর্ষণকারীরা পার পেয়ে যায়। আর দেশহীন, ঠিকানাহীন পরিচিতি নিয়ে এক অসহায় বাপ নীলকণ্ঠ বসে থাকে আপন মৃত্যুর প্রতিক্ষায়। পুরাকালের নকল যুদ্ধের প্রমোদ-মহড়া থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি ও কূটনীতির যাবতীয় পরাকাষ্ঠা যে আজও ছদ্মবেশে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্বের অধিকারকেই হনন করে চলেছে এ গল্পে তাই-ই এক ব্যঙ্গাত্মক ভাবনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশভাগ পরবর্তী জীবন-যুদ্ধের শরিক এই তথাকথিত নাগরিকত্বহীন, বাস্তুহীন মানুষগুলির মুমুর্ষূ বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পের অন্তিম ব্যাখ্যায়। লেখক বলেনঃ **"পুনশ্চ নিবেদন এই যে, সেই ব্যক্তি নীলকণ্ঠ আধিয়ার সেই গ্রামেই রয়ে গেছে। তাহার ভারতীয় ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড সব ভারতেই রয়ে গেছে। মেয়ে মরেছে যেখানে সেখানে সে পরিচয়হীন হয়েই মরবে। মরবেই। সে জানে সেই ধর্ষক তিন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া যাইবে একদিন না একদিন। কেন না সে হত্যাকারীদের চেনে। আর নীলকণ্ঠ আধিয়ার হত হইলে সেই চারদিন ধরিয়া তাহার লাশ পচিবে এখানে। সে তো ইন্ডিয়ার লোক, কিন্তু বাংলাদেশ যাইয়া মরিবার অধিকার তাহার আছে কি? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক ইহাতে মত দান করিবে জানি, কিন্তু আমাদিগের নিকট এই বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। আমরা সেই সিদ্ধান্তের জন্যই অপেক্ষা করিতে থাকিব, এত বছর তো অপেক্ষা করিলাম। নীলকণ্ঠের অপেক্ষা আরম্ভ হইল সবে। নির্বিঘ্নে হত হইবার জন্য সে দেশহীন হইয়াছে।"**[১২] বঞ্চিত, উদ্বাস্তু জীবনের নির্মম আত্মগ্লানিতে ভরা এমন হাহাকার এই পত্র-পংক্তির ছত্রে ছত্রে অনুরণিত। সেইসঙ্গে গল্পটিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে গল্পকারের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনা লালিত এক অনন্য কল্পলোক যা থেকে আমাদের গড়া উত্তর প্রজন্ম তার দায় ও দায়িত্বকে মেপে নিতে পারি। পার্টিশন ভাবনার সমকালীনতায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে এ গল্প। গল্পের উত্তম পুরুষে কথিত পত্ররীতিটিও অভিনব।

'অন্ন-পরমান্ন' গল্পে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্মের চোখে পূর্বপুরুষদের ছেড়ে আসা ভিটে অতীত স্মৃতির ছায়াপথ ধরে বর্তমানের সরণীতে এক স্বপ্ন-কল্পনা হয়ে ফিরে এসেছে। দেশভাগের পরবর্তী এপার বাংলার প্রজন্ম আবীর দত্ত খুলনার শহীদুল হাসানের সাথে বহুদিন পরে বাংলাদেশের ধূলিহরে এসেছে তার পিতৃ-পিতামহের ভিটে দেখতে। তাদের পথ চিনিয়েছে বুধাহাটার শুকুর আলি। আবীরের পিতা সুশীল দত্ত ও সুবোধ দত্তের বাস্তুভিটে আজ অন্যের। '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দিলোয়ার হোসেনকে সেই ভিটে বিক্রি করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতা চলে আসে দত্ত পরিবার। এখন সেই ভিটেয় বাস করে দিলোয়ারের ছেলে সিদ্দিক, নাজমা। দিলোয়ার এ বঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সেখানে। আজ সেও বেঁচে নেই। দত্ত ভিটের

খিড়কির পুকুরের ওপারে, কলাবাগানে কবরে শুয়ে আছে সে। দত্ত পরিবারের পিতৃপুরুষদেরও অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। বেঁচে নেই ছোটকাকা সুশীল দত্তের স্ত্রী, আবীরের ছোটকাকি অনিমারনি। জন্মভিটেয় পৌঁছে আবীর নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ে। ছোটাছুটি করে বালকের মতো। আবার কখনও বাস্তুভিটে থেকে শুরু করে পাশের পুকুর, ডোবা, রামকৃষ্ণ ধরের মেটে বাড়ি, সুপুরিবাগান—এর কোনো কিছুর সাথেই ছেলেবেলার দেখা স্মৃতিকে মেলাতে পারে না। সিদ্দিকের বৌ নাজমা একমাথা ঘোমটা দিয়ে দেখে মধ্যবয়সী একটা লোক কখনও চোখ মুছছে রুমালে—কখনও উঠোন থেকে মাটি তুলে সেই রুমালে বেঁধে নিচ্ছে তা। আবীরের কাছে সিদ্দিকের বৌ নাজমাকে তার ছোটবেলায় দেখা ছোটকাকি অনিমারানির মতো মনে হয়। অন্ধকারে দাঁড়ানো সুপারি, আম, জাম আর জামরুল গাছগুলো যেন তাদের ভিটেমাটির উত্তরপুরুষকে স্বাগত জানায়। নাজমার চোখের জলকে সুবীরের ছোটকাকির চোখের জল বলে মনে হয়। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো অতীত স্মৃতিরা বেদনা নিয়ে ফিরে আসে। নাজমা শুকুর আলিদের ভাত খেয়ে যাবার কথা বলে। কিন্তু আবীর ভাত খাবে না, সে শুধু পিতৃ-প্রপিতামহের ভিটে দেখতেই এসেছে। অবশেষে নাজমা আবীরের হাতে তুলে দেয় ভাতগন্ধী পাতা। তার ঠাকুর্দার আমলের গাছ। এর সবুজ পাতা থেকে ভেসে আসে সুগন্ধী চালের তৈরী ভাতের গন্ধ। সেই পরমান্নের সুঘ্রানে যেন আবীর খুঁজে তার বাপ-ঠাকুরদার পরম আশীর্বাদকে।

এ গল্পে ফেলে আসা স্মৃতি-সত্তা-কল্পনা আর নস্ট্যালজিক অনুভূতির এক অনুপম মিশ্রণ চোখে পড়ে। তারই একটি সুন্দর বর্ণনা এমনঃ **"আবীর হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছে গাছেরা চোখ মুছছে। আবীরের পিছনে কত মানুষ হাঁটছে। গাঁয়ে খবর হয়ে গেছে দত্ত বাড়ির লোক এসেছে—ইন্ডিয়া থেকে। গাছেরা হাঁটছিল আবীরের সঙ্গে। কে যেন মাথায় ছাতা মেলে ধরেছে। সিদ্দিকের বউ নাজমার কাছ থেকে আমগুলো নিয়েছে আবীরের বন্ধু শহীদুল হাসান। তার সঙ্গে বুড়ো শুকুর আলি সুবোধ, সুশীল দুই ভাইয়ের কথা বলছিল। বলছিল গাঁয়ের প্রথম বি এ পাস সুবোধ দত্তর কথা। সুবোধের সঙ্গে এজাহার শানার খুব ভাব ছিল। গলায় গলায়, এক থালায়, তবু দেশটা দুই খণ্ড হয়ে গেল। দুই খণ্ড হতে কত রক্ত বয়ে গেল। দুই পারে দুই বন্ধু থেকে গেল। শানামশায় যদি বেঁচে থাকতেন, কী আনন্দই না পেতেন সুবোধ দত্তর ছেলেকে দেখে। আবীরের ভিতরে তার বাপ, ঠাকুর্দা, কাকা সবার ছায়া দেখতে পাচ্ছে বুড়ো শুকুর আলি। হাত নাড়লে, হাঁটলে সুশীল ডাক্তার, কথা বললে সুবোধ দত্ত, হাসলে বিমল দত্ত। আল্লার রহমত, না হলে এমন হয় কখনও? সুবোধ, সুশীলের ছায়া নিয়ে ফিরে আসে আবীর তার জন্মভিটেয়।"**[১৩] একইভাবে এ গল্পের শেষে আর এক উত্তর প্রজন্ম হেলালের কথায় তার ফেলে যাওয়া এ বঙ্গের অতীত ছায়া মেলেছে। সুবীর দেখেছে বেগুনি ভাসা ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে পড়েছে হেলালের চোখের জল। তার বাপ নছিম বলতো দাদা সালাউদ্দিন, বড়দাদা এনছান আর এপারের ইন্ডিয়ার মছলন্দপুরের কথা। মছলন্দপুর তার দেশ-গাঁ। কিন্তু সেই দেশ-গাঁ তার কখনো দেখা হয় নি। বাপ বলেছিল তার দাদা, দাদি, নানি, ছোট ভাই সবাই অন্তিম শয়ানে সেখানে শুয়ে আছে জামরুল গাছের তলায়।

গল্পটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অসাম্প্রদায়িক প্রীতি ও বন্ধন, দেশভাগপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও যাকে এতদিন বাদে মুছে ফেলে দিতে পারে নি—যা মিশে ছিল এজাহার-সুবোধে, তাই আজো মিশে আছে শুকুর আলি অথবা হেলালের আতিথ্য আর আলাপচারিতায়। অমর মিত্র যে পরিবারতন্ত্র তথা পারিবারিক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করেন—যে যৌথ পারিবারিক বন্ধন বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্যই শুধু নয়, যা দেশভাগপূর্ব বাংলার জীবনের এক অন্যতম আদর্শ—বিশেষ বৈশিষ্ট্যও, লেখক তাকে এ গল্পেও তুলে ধরতে ভোলেন না। এ গল্প অধুনা বঙ্গ সমাজ থেকে প্রায় মুছে যাওয়া সেই আদর্শকে ফিরে পাওয়ার গল্পও। এ গল্পের স্বপ্ন-কল্পনাসূত্র তার মানব-সম্প্রীতির সবটুকু লক্ষণকে মনোরেলে সঙ্গী করে বাস্তবের খুলনা-ঢাকা আর কলকাতাকে আরও কাছাকাছি এনে দেয়। সেইসঙ্গে আর্থসামাজিকতার পালাবদলও চিহ্নিত হয়েছে গল্পের একস্থানে। গল্পকারের ভাষায়ঃ **"একটা গাড়ি আসছে দুধসাদা। ঘাড় তুলে তাকায় শুকুর আলি। এমন গাড়ি তো আসে না এই গাঁ ধূলিহরে। সাতক্ষীরে সদরে গেলে চোখে পড়ে। আশাশুনির দিকে যাবে হয়তো। সাতক্ষীরে, মুন্সিপাড়া, ব্রহ্মরাজপুর, ধূলিহর ছুঁয়ে পাকারাস্তা চলে গেছে ফিংড়ি, বুধাহাটার দিকে। আজকাল কার হাতে কীভাবে টাকা এসে যাচ্ছে তা ধরা যায় না। সীমান্ত এলাকা, তার ওপরে মস্ত**

সড়ক হয়ে ঢাকা, খুলনা ঘরের দোরে এসে গেছে। কে ঢাকা চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে চাঁটগাঁ, কিংবা আকাশে উড়ে আরব দেশ, জাপান, সিঙ্গাপুর—দেদার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরছে। জাপানি গাড়ি পথে নামাচ্ছে।"[১৪] পরিবর্তনের এই ছবিও সত্য যা পরবর্তী প্রজন্মের চোখে দেখা।

'চোখ আর নদীর জল' গল্পে এক অসাধারণ বর্ণনা বিভঙ্গে উত্তর প্রজন্মের চোখে ছিটমহল সহ সাম্প্রতিক শাহবাগ আন্দোলনের কথা আছে। কিন্তু সেখানেই এ গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবনাটি থেমে থাকে নি, বরং তাকে অতিক্রম করে তা স্মরণ করায় তিস্তা জলবন্টন সমস্যা ও তার সাম্প্রতিকতম চুক্তির বিষয়টিকেও। ২০১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার শাহবাগে প্রজন্ম চত্বরে শাহবাগ আন্দোলন হয়। মূলতঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সকলের সর্ব্বোচ্চ সাজা প্রদান, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা ও জামায়াত-শিবির সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান বয়কটের দাবীতে নাগরিক অবরোধ, বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী সংঘটিত হয়। ২০১৩ সালের ২১শে জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ে আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকার)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর ৫ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় রায়ে কাদের মোল্লাকে ৩টি অপরাধের জন্য ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২টির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এতো বড় অপরাধের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে মেনে নিতে পারেনি বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগন। ফলে আন্দোলনকারীরা ঐদিনই শাহবাগে অহিংস বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। একসময় তা দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। দেশের অন্য যেসব স্থানে উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চট্টগ্রামের প্রেসক্লাব চত্বর, রাজশাহীর আলুপট্টি মোড়, খুলনার শিববাড়ি মোড়, বরিশালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বগুড়ার সাতমাথা, যশোরের চিত্রা মোড়, কুমিল্লার কান্দিরপাড়া, কুষ্টিয়ার থানা মোড় ইত্যাদি। শাহবাগের অনেকে বলেন যে তারা মৃত্যুদণ্ডের রায় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ চত্বর ছেড়ে যাবেন না। অন্যদিকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আনিসুল হকও বলেন যে কাদের মোল্লার সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সুযোগ এখনো রয়েছে। সমাবেশে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের উপায় হিসেবে আন্দোলনকারীরা বেছে নেন স্লোগান, গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি। প্রীতম আহমেদ তাঁর 'একাত্তরের হাতিয়ার' গানে বলেনঃ একাত্তরের হাতিয়ার/গর্জে উঠুক আরেকবার/রাজাকারের ফাঁসি হোক/শহীদরা পাক ন্যায় বিচার/ফাঁসি পাক রাজাকার/শহীদরা পাক ন্যায় বিচার/গন মিছিলে দামাল ছেলে মেয়ের দল/মুছিয়ে দেবে বীরাঙ্গনার চোখের জল/এই প্রজন্ম গড়তে জানে জনস্রোত/নেবেই নেবে একাত্তরের প্রতিশোধ।

অবশেষে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে আপিল নিস্পত্তির বিধান রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনীর প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩-এর সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাশ হয়। সংশোধিত আইনে একইসঙ্গে ট্রাইব্যুনালের যেকোনো রায়ের বিরুদ্ধে আসামির পাশাপাশি সরকারেরও আপিল করার সমান সুযোগ রাখা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে খুন এবং অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের জন্য আব্দুল কাদের মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০১৩, কাদের মোল্লাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিমলেশের কথায় দেশভাগের যন্ত্রনা আর স্বপ্ন উঠে এসেছে 'চোখ আর নদীর জল' গল্পে। এ গল্পে দেখি, উত্তর প্রজন্মের বিমলেশ বাংলাদেশের উত্তরে এসেছে ছিটমহল বুঝতে। রঙ্গপুর পৌঁছে বিমলেশের সঙ্গে ছিট আন্দোলনের ভূবনের বন্ধুদের দেখা হয়। বিমলেশের এদিকে আসার আর এক টান—এখানেই দেহ রেখেছিলেন তার মাতামহ নিখিলচন্দ্র ঘোষ। বুবলিন, পরভেজ ও ভূবনের কাছে বিমলেশ রঙ্গপুর ও শাহবাগ আন্দোলনের কিছু কিছু খবর পায়। পরভেজ তাকে জানায় তার মাতামহ সম্পর্কে। সে তাঁকে দেখেছিল ঢাকার শাহবাগ আন্দোলনের ধর্ণামঞ্চে রাজাকারদের ফাঁসির দাবীতে। যখন আলো পড়ে আসতো সেই শীতের গোধূলিবেলায় আসতেন তিনি।

সকলের শেষে একদম পিছনের সারিতে বসে থাকতেন। সন্ধের পর থেকে সারারাত ধরে যেন তারার মতো ছুঁয়ে থাকতেন শহীদ মিনারের ছায়া। তারপর রাত ফুরিয়ে আসলে কখন মিলিয়ে যেতেন ভোরের আবছা আলোয়। গল্পে দেখি রঙ্গপুর থেকে পঞ্চগড়গামী বাসে এরপরই বিমলেশের স্বপ্নাচ্ছন্ন অনুভূতিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ং নিখিলচন্দ্র। চলন্ত বাসে নিদ্রামগ্ন ভুবনের পাশের জবুথবু চাদরের আড়াল থেকে যেন জেগে উঠেছে সেই মানুষটা। বিমলেশের সাথে শুরু হয়েছে তাঁর কথোপকথন।

নিখিলচন্দ্রের সাথে বিমলেশের সেই কাল্পনিক কথোপকথন সূত্রে উঠে এসেছে গল্পের আর এক সত্য। স্বাধীনতা আর দেশভাগের পর তাঁর ভাই-বোন, মেয়ে-জামাই, ছেলে-ছেলের বৌ, বেয়াই-বেয়ান, নাতি-পুতি সহ তাদের সন্তান-সন্ততির সবাই চলে এসেছে এপারে—রেলের চাকুরীসূত্রে শুধু তিনি একা রয়ে গেছেন ওপারে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগায় আর ইস্টবেঙ্গল রেল ই. বি. আর. বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্টেশনমাস্টারবাবুর তাঁর স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়ার পথও চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। নিঃসঙ্গ, অসহায় হয়ে তিনি রয়ে গেলেন ওপার বাংলায় একা। একদিন ছিটমহলের থেকেও বিষণ্ণ নিখিলচন্দ্রের বুকে বড় হয়ে বিঁধেছিল পূর্ববাংলার শুখা। জলকষ্টেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সে কথা জানা যায়, শ্রীরণেষু বাবাকে লেখা বিমলেশের মায়ের সেই চিঠি থেকে। নদীর দেশের মানুষের মৃত্যু হয়েছিল পরিবার-পরিজন থেকে বহুদূরে—জলতৃষ্ণায়। আর তারই আবহে গল্পে উঠে এসেছে আর এক সামাজিক সত্য। তা হলো নদী বিভাজনের ফলে বাংলা দেশের খাল-বিল, নদী-নালার অপমৃত্যু। গল্পকারের কথায়ঃ **"মাস্টারবাবু বলল, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, দেশের মানুষ, সবাই জানুক, আমাদের সব নদীও মরে যাচ্ছে। –আঁজ্ঞে? বিমলেশ বলল, আমি তিস্তা দেখলাম, জল নেই, ধূ ধূ বালির চর। –তিস্তা কেন, যমুনা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমার, করতোয়া, সংকোশ, হলহলিয়া, সোনাভরি, জিঞ্জিরাম, ডাহুক, চাওয়াই, কুড়ুম, ছোট তিস্তা, তালমা, ঘোড়ামারা আমাদের কত নদী, কীর্তনখোলা, রূপসা, ভৈরব, ইছামতী, মধুমতী, চিত্রা, গড়ুই, কপোতাক্ষ...সব মরে যাচ্ছে। তিনি মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন।–আমি সামান্য মানুষ, আমার কথায় কী হবে? বিনীত গলায় বলল বিমলেশ।–হবে, হবে, আমি শুধু এই কথাটা বলতেই আপনার পিছে পিছে ঘুরছি ক'দিন, নদীর উজানে বাঁধ বেঁধে জল আটকে দিয়েছে ওপারের মানুষ, আমরা এক ছিলাম, এক নেই, আমাদের নদী যদি চলে যায়, শ্মশান হয়ে যাবে সব, আপনি বলুন গিয়ে।"**[১৫] পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অপরিসীম ভূমিকা জলসেচের আর জলসেচের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই সেখানে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তিস্তায় জলের প্রবাহ ধীরে ধীরে কমতে থাকায় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছিল কৃষি ও মৎসজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ১৯৭২ সালে আন্তঃসীমান্ত নদী সমূহের উন্নয়নের দিকগুলিকে সামনে রেখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (জে.আর.সি.) বসে। যদিও এখনও পর্যন্ত তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে দু দেশের মধ্যে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারে নি।

'চোখ আর নদীর জল' বাংলাদেশের নদী-মানচিত্রে শুকিয়ে যাওয়া নদীদের গল্প, যার সাথে মিশে আছে মানুষের চোখের জল, কান্নার ইতিহাস—লালমণিরহাট জংশন স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের ঠিকানায় লেখা একটি চিঠি ধরে রেখেছে সেই শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুজলকে। একটি মানুষ অথবা একটি পরিবারের কাহিনী কিভাবে দেশভাগপূর্ব একটি সম্পূর্ণ জনপদের অতীত ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে; সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে তার মৃত্তিকা-বিচ্ছিন্ন স্মৃতিবেদন—তারই জীবনভাষ্য এ গল্পটি। জল আর জীবন যে এক তা আরও একবার প্রমানিত হয় এ গল্পসূত্রে। শুকিয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ আর তিস্তার শুকনো পলি স্মরণ করিয়ে দেয় ক্ষীয়মান মানুষী সম্পর্কের বর্তমান রূঢ় বাস্তবতাকে। নদী শুকিয়ে গেছে—কিন্তু উদ্বাস্তু জীবন থেকে শুরু করে আজও এপার বাংলার মানুষের হৃদয়ে ওপার বাংলার নদীরা যেন ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তাদের স্বপ্নের গান শুনিয়ে চলেছে। এ গল্পে বাংলাদেশের নদ-নদীর পাশাপাশি ইতিহাসের বুকে রয়ে যাওয়া নানা ছোট ছোট গ্রাম, রেলওয়ে স্টেশন, নগর, বন্দরের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের ডামডিম, ডিমলা, মেটেলি, দোমোহনি রেলস্টেশন, তুষভাণ্ডার, তিস্তা জংশন তার এমনই কয়েকটি। এছাড়াও এ গল্পে ওপার বাংলার রঙ্গপুর, ঠাকুর গাঁ, রাণির বন্দর, যমুনাব্রিজ, টাঙ্গাইল, নাটোর,

বাগেরহাটের নাম মেলে। সব মিলিয়ে গল্পটি যেন একের মধ্যে আর এক গল্প, কল্পনার মধ্যে আর এক কল্পনা। মৃত বাবার উদ্দেশ্যে বিমলেশের মা অনিতার লেখা চিঠিটি কল্পনা হলেও তা গল্পে এক বাস্তব জীবন সত্যকেই প্রতিভাত করেছে। গাঙের বালি, কপোতাক্ষের শুকনো মৃত চড়া যেন আজকের প্রজন্মের দুই বাংলার মানুষের মনুষ্যত্ববোধের শুষ্ক, প্রাণহীনতাকেই চিহ্নিত করে তুলেছে। তিস্তা, করতোয়া, যমুনা, ডাহুক, তালমা, চাওয়াই-এর বুকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর মধ্যে যেন আজও জমে আছে সজলতাহীন তীব্র গ্লানির এক অপরিশোধ্য ইতিহাস! দেশভাগের এতদিন পরেও যার কালিমা আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি। বিমলেশের পড়া মায়ের চিঠির শেষ লাইনগুলি হৃদয়বিদারক। লেখকের ভাষায়ঃ **"বিমলেশ পড়তে থাকে, তোমার তেষ্টা মিটেছে কি না কে বলবে? বাবা, মনু নেই, দাদা নেই, তিনু নেই...তোমার সঙ্গে কি তাদের দেখা হয়েছে? মনু খুব কষ্ট পেয়ে গেছে। অভাব অসুখ দুই-ই এপারে তাকে খেয়েছিল। তার সেই মা দুগগার মতো রূপে পোকা ধরেছিল। তুমি আর মা তাকে শান্তি দিও।"**[১৬] দেশভাগের হৃদয়দীর্ণ বেদনার অনুরণনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে চিঠির শেষ কথাগুলি। অন্যদিকে বিমলেশকে বলা নিখিলচন্দ্রের শেষ কথাগুলিও দেশভাগের নেপথ্যে চাপা পড়া যন্ত্রনাকে বুকের রক্ত, চোখের অশ্রু আর নদীর জলের শতধা ধারায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। লেখকের ভাষায়ঃ **"চাপা গলায় বলতে থাকে স্টেশনমাস্টার, আমার রক্তরে কহিও আমার চোখের জল না শুকায় যেন, দুঃখে কষ্টে, আনন্দে যেন চোখের পানি ফেলতে পারি, পদ্মা মেঘনার জল আমার চোখের পানি, সেই জল আনন্দে যেমন ঝরে, দুঃখেও ঝরে। এই দেখ বাবু, তোমারে কি আমি চিনিনে, চিনেছি, এলে সেই অঘ্রাণের শেষে, অঘ্রাণ ফুরায়ে এল, ধানকাটা হয়েছে শেষ, রাত জেগে নবান্নের আয়োজন, কিন্তু কপোতাক্ষ শুকায়েছে বলে, ঘরের মানুষ ঘরে ফেরে নাই, করতোয়া, তিস্তা, যমুনা, ধরলা ডাকে, জল দাও জল দাও।"**[১৭] গল্পের শেষে দেখি, কখন বাস থেকে নেমে যাওয়া নিখিলচন্দ্র মিলিয়ে গেছেন রাণির বন্দরে, জবুথবু গঞ্জের হিমেল বাতাসে এক বুক বেদনা ছড়িয়ে। শুধু ওপার বাংলার বুকে ফেলে আসা হারানো জীবন, ধূসর স্মৃতি আর একরাশ বিচ্ছেদের হাহাকার শুকনো পলিময় গাঙের চড়ায় এক নিসঙ্গ, ভাঙা পানসির মতই আটকে রয়েছে গল্পের বুকে ছড়িয়ে যাওয়া কিছু দীর্ঘশ্বাসী শব্দবন্ধে।

নদী যে জীবনেরই সার্থক রূপক তা আরও একবার চিহ্নিত হয়ে ওঠে লেখকের 'হারানো নদীর স্রোত' গল্পটির নামকরণে। গল্পের শুরুটাই তেমন। লেখকের ভাষায়ঃ **"অনাথ বিশ্বাস বাই লেন থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ে হাঁটাপথে গঙ্গা একটুখানি। আমাদের দু'কামরার ফ্ল্যাট থেকেই ছেলেবেলায় লঞ্চের ভোঁ শুনেছি মনে পড়ে। মনে পড়ে মা তখন নিজের বাপের বাড়ির কথা বলত, কপোতাক্ষ নদীর তীরে কাটিপাড়া ছিল সেই গ্রাম। সেখানেও না কি ঘরে শুয়ে শোনা যেত শেষ রাতে ডাকা প্রথম লঞ্চের ভোঁ। কী আশ্চর্য, এক নদীর কূল থেকে আর এক নদীর কূলে এসে জীবন আছড়ে পড়ল।"**[১৮] অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের দু'কামরার ফ্ল্যাটে একালের প্রজন্ম গল্পকথকের দেখা জীবনের ছোট ছোট পরিবর্তন আর আশা-আকাঙ্খার কথা দিয়ে এ গল্প শুরু হয়েছে। কিন্তু গল্পকারের লক্ষ্য এর চেয়েও বড়ো এক পরিবর্তনকে তুলে ধরা—যা গল্পকথক পুত্রের পিতা মুকুন্দ পালের গোটা জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে। স্বাধীনতা আর দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার বেত্রবতী আর কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী বড়োদল গ্রাম ছেড়ে এ বঙ্গে আসা মুকুন্দ পাল ও তার স্ত্রী ললিতা জানতো নদী না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায়, তাই পুত্র ও তার পরিবার অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের বাস গুটিয়ে অনত্র্য চলে যেতে চাইলেও মুকুন্দ তার মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত এই গঙ্গাতীর ছেড়ে যেতে চায় নি। হঠাৎই একদিন ফেলে আসা গ্রাম বড়োদল থেকে তাদের সেই অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে ওপার বাংলার এজাহার-মোজাহার পরিবারের উত্তর পুরুষ সিকান্দার আলি। সিকান্দারের মুখে জানা যায়, তার চাচা মোজাহার মারা গিয়েছিল খানসেনাদের হাতে আর আব্বা এজাহার সেই শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ পাল ছিলেন তার নিজে হাতে প্রতিষ্ঠা করা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারমশায়, রোশেনারা বিবি ছিল সিকান্দারের 'ধর্ম মা' আর আঞ্জুমান বিবি ছিলেন মুকুন্দ পালের স্ত্রী—তার চাচি ললিতার পাতানো সই। সুন্দর সখ্যতা ছিল দুই পরিবারের। আঞ্জুমান ও ললিতা দুই সখী একে অপরের বাগানে আমের চারা পুঁতেছিল। এজাহারের পরিবারের কেউ যেমন সিকান্দারের রক্তের সম্পর্কের ছিল না, তেমনি মুকুন্দর

পরিবারের কেউই তার আপনজন নয়, তবু দেশের টান যে বড় টান! তাই সে দশ বছর পরও অতদূর থেকে এসেছে দেশের খবর দিতে। সিকান্দারের মুখ থেকেই জানা যায় এককালের অত্যন্ত রূপবতী, তার ধর্ম মা রোশেনারার মৃত্যু সংবাদ। আর জানা যায় ওপার বাংলার নদী বেতনা, কপোতাক্ষ, সুনাই-এর একে একে শুকিয়ে যাবার কথা।

এরপর সিকান্দার চলে যায় গোবরডাঙায়। বড়োদল থেকে চলে আসা বিনোদ বিশ্বাস, অজিত কুন্ডু, প্রণবানন্দ মল্লিকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেশ-গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে—নাহলে বড়োদল বাঁচবে না, গাঙের পানি আরো শুকিয়ে যাবে। গল্পকারের ভাষায়ঃ **"বিড়বিড় করে সিকান্দার, হিন্দুরা দেশ ছাড়তেছে, ভিটেমাটি বাগান পড়ে থাকতেছে, লোভী মানষে দখল করে নেচ্ছে, লোভে হিন্দুদের তাড়াচ্ছে, কিন্তু এডা যেমন সত্যি, তেমন সত্যি তারা দেশ ছেড়েই বা আসতেছে কেন কও দেখি চাচি, ওডা তাদেরও দেশ, যদি হিন্দু মোছলমান দুজনেই না থাকল একটা দেশে, গাঙে পানি থাকে? খেরেস্তান মধুকবির কপোতাক্ষ কবিতাটা মনে মনে শুধু আওড়াতি হয় চাচি, গাঙের পানি তো সবাইরে লিয়ে হয়, দেশডার পরাণ শুকোয় যাচ্ছে।-মা কেঁদে উঠল, এ কী কথা শুনাতে এলে! -কত শুনবা চাচি, সুনাই নদী জানতে তো, সে গাঙ ধূ ধূ করে, পানির বংশ নাই, একটার পর একটা নদীর পতন হচ্ছে মিলিটারি পতনের মতন, দেশ শূন্য হয়ি যাচ্ছে, হিন্দুরা সবাই চলি এলি বড়োদল, কপোতাক্ষ, ঢাকা, বরিশাল মরুভূমি হয়ে পড়বে।-বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে বুকের উপর এসে শুকিয়ে যাচ্ছিল।"**[১৯] সিকান্দার চলে যাবার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে মুকুন্দ। মুকুন্দর স্ত্রী ললিতার ধারণা হয় সুন্দরী রোশেনারার মৃত্যুসংবাদ মারাত্মক আঘাত করেছে তাকে। মুকুন্দর ছেলের মনে হয় দেশঘরের নদ-নদীর শুকিয়ে যাবার খবরে বিচলিত হয়েই বাবার এ অসুস্থতা। অবশেষে মুকুন্দকে ভর্তি করা হয় নার্সিংহোমে। একদিন স্বভূমি ছেড়ে চলে আসা যে ঠাকুরদাস মিত্তির, শৈলেন, গোবিন্দ, বলরাম, দুর্গা কাকা আর রমেনদা, নগেনদাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মুকুন্দ পাল তার বাসা বাড়িতে, খবর পেয়ে তারা সবাই একসাথে এসে হাজির হয়েছে নার্সিংহোমে মুকুন্দকে দেখতে। অসুস্থতার কারণে মস্তিষ্ক কাজ না করায় মুকুন্দ তাদের চিনতে পারে না ঠিকই, কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে তখনও ভেসে বেড়ায় বড়োদল গ্রামটির নাম। মুকুন্দ আবারও তাদের তার অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের বাসায় আসার আমন্ত্রণ জানায়—কারণ, সেখান থেকেই ভাবতে হবে আবার ফিরে যাওয়া যায় কিনা বড়োদলে—নিজের গাঁয়ে, জন্মভূমিতে।

দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্ম তার পূর্ববর্তী প্রজন্ম বাবা মুকুন্দ পাল ও মা ললিতার অনুভূতির মধ্যে দিয়ে খুঁজে পেয়েছে দেশের আনন্দ-বেদনাকে। সেই আনন্দ আর বেদনাকেই গল্পে ঘনত্ব দান করেছে সিকান্দারের উপস্থিতি, জাফর মন্ডল কিংবা ইকবাল ভাইদের স্মৃতি। হিন্দু-মুসলিম মর্মপ্রীতি এ গল্পেরও এক বড় সম্পদ। এতদিন গল্পকথক মুকুন্দ-পুত্রের কাছে ছোটবেলায় দেখা তাদের অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের বাসায় আশ্রয় পাওয়া ওপার বাংলার স্বজনরাই ছিল দেশভাগের একমাত্র স্মৃতি। কিন্তু দেশগাঁয়ের আত্মীয়দের সেই বন্ধন যে কত জোরালো আর আন্তরিক তা সে উপলব্ধি করেছে তাদের সবাই মিলে নার্সিংহোমে মুকুন্দকে দেখতে আসার ঘটনায়। উত্তর প্রজন্মের কাছে আদর্শ আর অনুভবের এ এক মস্ত উত্তরাধিকার। আর মুকুন্দ? গাছ যখন ফিরে পায় তার ছিন্ন শিকড়ের সন্ধান তখন তার মনে যে আবারও জেগে ওঠে বাঁচার সাধ তা স্মরণ করিয়ে দেয় মুকুন্দের শেষ আচরণ। লেখকের ভাষায়ঃ **"শৈলেন কাকা এগিয়ে এলেন, ও মুকুন্দদা, মুকুন্দদা?—বাবা সাড়া দিলেন না। নিজের নামটাও বোধহয় ভুলে গেছেন। শুধু মনে আছে বড়োদল গ্রামটির কথা। জল থই থই নদীর কথা। নদীতে ভাসা স্টীমার, নৌকোর কথা। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আরও অনেকজন উঠে আসছে, ওপার থেকে নদীর স্রোতের মতো মানুষ আসছে মুকুন্দ পালকে দেখতে। বেত্রবতী, কপোতাক্ষ ঢুকে পড়েছে নার্সিংহোমের ভিতরে ... ... বাবা একা বসে আছেন। জোড় হাত, চোখে জল। এখন সন্ধ্যা নেমেছে। বেত্রবতী, কপোতক্ষর দুই তীরে অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। শুধু নদী বয়ে যাচ্ছে আর অন্ধকারে, দূর সমুদ্রের দিকে। আলোর শেষ বিন্দুটুকুও মুছে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। শেষ কণ্ঠস্বরটিও হারিয়ে গেছে নদীর অনন্ত স্রোতে। বাবা বসে আছেন স্তব্ধ প্রকৃতির ভিতর একা। বাবার চারিদিকে কেউ নেই। একজনও না। অন্ধকার বাবার চোখের জল পড়ল অন্ধকারে।"**[২০] নদী মাতৃক বাংলাদেশে নদীর অপমৃত্যুকে রোশেনারার মৃত্যুর মতোই মেনে নিতে পারে নি মুকুন্দের মন। কিন্তু সেই মনই যেন সুস্থিতির শান্তি

লাভ করতে চেয়েছে স্বজনদের ফিরে পেয়ে। একদিকে দেশভাগের ফলে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিতে চালিত পূর্বপ্রজন্মের অবচেতন মন আর অন্যদিকে জল ও জীবন রূপ অভিন্ন দুই সত্তাকে—একই শাশ্বত সত্যের অভিমুখী করে তুলেছে গল্পের অনিঃশেষ ব্যঞ্জনা। আর তার থেকেও এ গল্পে যা বড় সত্য তা হলো, মুকুন্দ-পুত্রের মনে জেগে ওঠা মুকুন্দের অন্তিম আত্মস্থিত অনুভব—যা আমার কাছে মনে হয় এক ধ্যানমগ্ন প্রজ্ঞা—সে যেন সমাহিত মনের এক পরম স্থিতি—সোহম অনুভূতি, যেখানে অতীত-বর্তমান, স্বদেশ-স্বজন, নদী-প্রকৃতি, আনন্দ-বেদনা, রূপ-অরূপ, আপন-পর এক ধীর-স্থির, একাত্ম ও একীভূত দার্শনিক চেতনার বিন্দুতে বিলীন হয়ে যায়।

'দমবন্ধ' গল্পটি দেশভাগ পূর্ব অতীত সম্পর্কের অনুসন্ধান ও বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে এক জটিল মেরুকরণের গল্প। এ গল্পে গড়ে ওঠা দুই মেরুর একদিকে আছে প্রভাময়ীর দেশভাগপূর্ব অতীত সম্পর্ক অন্বিত গভীর অভিনিবেশ ও গোপন অনুসন্ধিৎসা আর অন্যদিকে রয়েছে সুরেন ভদ্র ও তার স্ত্রীর বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে খন্ডন করার দুরন্ত চালাকি অথবা কৌশল। মধ্যেখানে রামগড়ের সুরেন ভদ্রের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার পুত্রের সাথে বীরেন্দ্র-কণ্যা বিচিত্রার বৈবাহিক সম্বন্ধ ও তিরিশ হাজার টাকা পণ দাবীর বিষয়টি সেতুবন্ধের মতো গল্পে আটকে রয়েছে। সফল মানুষ বীরেন্দ্র উচ্চপদস্থ ডেপুটি সেক্রেটারীর সরকারী পদ থেকে সদ্য অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁরা চার ভাই। তিনি মেজো। কৃতি বড়োভাই নরেন্দ্র প্রয়াত। তাঁর স্ত্রী প্রভাময়ীর চার সন্তানের মধ্যে দুই ছেলে থাকে কলকাতায়। বড় নবনীত আই.এ.এস. অফিসার, বিবাহিত, পরিবারের সব থেকে কৃতি সন্তান। মেজো ছেলে নীলাঞ্জন পেশাদারী কৌলীন্যে খাটো হলেও কৃতি ব্যবসায়ী ও বিবাহিত। এছাড়া দুই মেয়ে মিলু ও টুকু বিবাহিতা, একজন ভূপালে ও অন্যজন ওয়েস্ট আফ্রিকায় থাকে। সেদিক দিয়ে প্রভাময়ী সাংসারিক দিক থেকে অনেকখানি চাপমুক্ত। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীর দুটি বনেদী ও বর্ধিষ্ণু পরিবার নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রের আরো দুটি ভাই আছে—তারা যথাক্রমে ধীরেন্দ্র ও হীরেন্দ্র। থাকে বনগাঁর কাছে মসলন্দপুর গ্রামে। পার্টিশনের সময় এক্সচেঞ্জ করে যেটুকু সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছিল সেটুকু নিয়ে একেবারে দেশ-গাঁয়ের মত সেখানে আছে তারা দুজন। তবু ধীরেন্দ্র ও হীরেন্দ্রের মধ্যে সম্পত্তির বাঁটোয়ারা নিয়ে যে উৎকট বিবাদ তা নরেন্দ্রের পারলৌকিক কাজের দিনও প্রভাময়ীর গৃহে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল গল্পে তার বিবরণ আছে। পঞ্চাশ ছোঁয়া দুটো গেঁয়ো মানুষের দাদার মৃত্যুর জন্য কান্না ও পরক্ষণেই নবনীতের কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে চিটিংবাজির অভিযোগ, ভাইয়ে-ভাইয়ে বাকবিতন্ডা আর ঝগড়া সেদিনকার পরিবেশে যেমন অভিপ্রেত ছিল না তেমনই তা বিরক্তি ও অস্বস্তি উৎপাদনের পক্ষেও যথেষ্ট ছিল।

গল্পের শুরুর ঘটনায় জানা যায়, বীরেন্দ্র এসেছে বৌদি প্রভাময়ীর কাছে তার মেয়ে বিচিত্রার বিয়ের সম্বন্ধের কথা জানাতে। এর আগে পণের কারনে বহুবার বহু সম্বন্ধ আটকেছে। অবশেষে কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপনে কিনা বীরেন্দ্রর পছন্দ অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ—অর্থাৎ নিজেদের পূর্বপুরুষদের দেশের পাত্রই তিনি পেয়েছেন। বৌদির কাছে তার আসার কারণ হলো পাকা কথা বলার দিন তিনি নবনীতকে পাশে পেতে চান—কারণ নবনীত তাদের কূলের গৌরব। কথাবার্তায় আরো জানা যায়, পিতৃপুরুষাদিক্রমে আদি নিবাস খুলনার সুরেন ভদ্র বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার রামগড়ে থাকেন। পাত্র তার একমাত্র সন্তান, কৃতি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোলে পোস্টেড। আসলে বীরেন্দ্র অত্যন্ত হিসেবী মানুষ। পাত্রপক্ষের দাবী করা তিরিশ হাজার টাকা পণ তার গায়ে লাগছে। একথা বুঝতে পারেন প্রভাময়ী। এদিকে প্রভাময়ীর শ্বশুরবাড়ি ছিল ওপার বাংলার ধূলিহর। তার কাছে বীরেন্দ্রর আসার আসল কারণ যে নবনীত নয়, বরং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেমন তিনি বুঝতে পারেন, তেমনই সুরেন ভদ্রের আদি নিবাস খুলনা জেনে তিনি ওপার বঙ্গের সাবেক শ্বশুরমশায়ের বন্ধু জীবন ভদ্রের পরিবারের সাথে তার লতায়-পাতায় সম্বন্ধ বোঝার ও খোঁজার চেষ্টাও শুরু করেন। আত্মপ্রত্যয়ী প্রভাময়ী। কারণঃ **"তখন তো এত মানুষ ছিল না, দেশ ভাগও হয় নি যে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায় থাকবে, বড়োজোর এ গাঁ ও গাঁ, আর বিয়ে থা-ও হত জেলার মধ্যে, সব চেনা যেত।.... খুলনা জেলার ভদ্র মানে তো জীবন পিসেমশায়রা। উনি তো আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকতেন, ওখানে যত ভদ্র সব ওর আত্মীয়, হতেই হবে।"**[২১] সুতরাং শুরু হয় নব ঘুরানো রেডিও বাংলাদেশ খুলনার মতিন মিঞার আসর-এর মত

মনের চেনা-জানা অলি-গলি পথ ধরে ধূলিহর, ফিঙরি, উতুলি, হড্ডিলির হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলির সাথে নতুন করে যোগসূত্র আবিষ্কারের পালা। এর আর এক কারণ হলো, একদা তার পিসশ্বশুর ও প্রয়াত শ্বশুরমশায়ের সর্বক্ষণের পাশাখেলার সঙ্গী জীবন ভদ্রের পরিবারের সাথে যদি এ প্রজন্মের সুরেন ভদ্রের পরিবারের সম্পর্কসূত্রটি কোনোভাবে বেরিয়ে পড়ে তবে পণের টাকার প্রসঙ্গটি গৌণ হয়ে যাবে—কারণ, আত্মীয়ের কাছে অযথা পণ চাওয়া যায় না। এতে দুটি লাভ হবে। প্রথমতঃ বিচিত্রার বিবাহের জন্য প্রভাময়ীকে আর ঐ পণের টাকা বীরেন্দ্রর হাতে তুলে দিতে হবে না, অথবা এবং দ্বিতীয়তঃ পণের টাকা লেন-দেন যে এক সামাজিক অপরাধ—এ সত্য বোঝাবার জন্য তার আই.এ.এস. পুত্র নবনীতকেও আর পাকা কথার দিন পাত্রপক্ষের সম্মুখে হাজির হয়ে বিব্রত হতে হবে না। অগত্যা বীরেন্দ্রকেও প্রভাময়ীর দেখানো পথ মেনে নিতে হয়েছে। প্রভাময়ী রাজি হয়েছে পাকা কথার দিন বীরেন্দ্র ও তার পরিবারের সাথে রামগড় যেতে। পাকা কথার দিন কিন্তু সুরেন ভদ্রের পূর্ববঙ্গের আদি সম্পর্ক খুঁজে বার করার এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রভাময়ীর সুচতুর এ উদ্দেশ্যের প্রকৃত কারণ ধরে ফেলেন খুলনার বাঁকা সংগ্রামপুরের মেয়ে, সুরেনের স্ত্রী। উল্টে সুরেনের স্ত্রী শুনিয়ে দেন মসলন্দপুরের 'ফোর টোয়েন্টু' প্রভাময়ীর দুই দেওর আর তাদের জে.এল.আর.ও-র পিয়ন ছেলেটির কথা। এ যেন দাবার উল্টো চালে কিস্তিমাতের প্রয়াস। এই কৌশলে শেষপর্যন্ত হেরে গেছেন প্রভাময়ী। অসম্ভব এক উৎকণ্ঠায় ও অপমানে দমবন্ধ হয়ে এসেছে তার। লেখকের বর্ণনায় সে দৃশ্যঃ **"প্রভাময়ী কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। পারছিলেন না। চোখের সামনে মহাশূণ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নেই। ঠিক গত রাতের মতো কোথাও কোন শব্দ নেই। স্তব্ধ আকাশ অন্ধকার তাঁকে ঘিরে ধরছে ক্রমশ। একা লাগছিল প্রভাময়ীর। খুব একা। কাল রাতে বাতাসটুকুও ছিল। এখন তো তাও যেন নেই। প্রভাময়ী প্রাণপণে অদৃশ্য ট্রানজিস্টারের নব ঘুরিয়ে চলেছিলেন। খুলনা, সাতক্ষীরে, ইছামতী, রুপসা, উতুলি, হড্ডিলি, ফিঙড়ি, ধূলিহর সব পার করে এ পারের মসলন্দপুর থেকে চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন ইথার তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্রমশ। সেই শব্দ ঘিরে ধরছে তাঁকে। দমবন্ধ হয়ে আসছে একটু একটু করে।"**[২২]

সমগ্র গল্পটিতে আছে সম্পর্কের এক অভিনব মূল্যায়ণ। বিভক্তিপূর্ব ওপার বাংলার বড় পরিবারগুলির এমন আধুনিক মূল্যায়ণ বাংলা সাহিত্যে এর আগে হয় নি। গল্পটি পাঠকের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণেরও অপেক্ষা রাখে। এ গল্পের দুইদিকে আছে পার্টিশন আইডেন্টিটির দিকচিহ্নবাহী দুটি পরিবার—একটি নরেন্দ্র-বীরেন্দ্র-ধীরেন্দ্র-হীরেন্দ্র সহ প্রভাময়ীর পরিবার আর অন্যটি সুরেন ভদ্রের পরিবার। প্রজন্মের দিক দিয়ে এরা সবাই আধুনিক। কিন্তু আর একটি দিক দিয়েও খুব মিল আছে এদের। এরা সকলেই পার্টিশন বিচ্ছিন্ন ও অধুনা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাবাসী উদ্বাসিত পরিবার। তবুও পরবর্তী প্রজন্মের বিবাহ সম্পর্ক নির্ধারণে বীরেন্দ্রের মতো এদেরই কেউ কেউ আঁকড়ে ধরতে চায়, হাতিয়ার করতে চায় তাদের পার্টিশনপূর্ব আত্মপরিচিতিকে। আজও হামেশাই তা লক্ষণীয়। কিন্তু প্রজন্মান্তরে বহমান এই পার্টিশন আইডেন্টিটি যখন অর্থ আর স্বার্থের বন্দীদশার মাঝে পড়ে যায় তখনই তার নিদারুণ বিনাশ ঘটে। 'দমবন্ধ' সেই ক্রুর-নিনাদী বিনাশেরই করুণ আলেখ্য। সেই অর্থ আর স্বার্থের দ্বন্দ্বকেই এখানে দুটি পরিবারের আত্মমধ্যস্থিত, আপাত অন্তরিত বিরোধাভাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার। শেষপর্যন্ত বিচিত্রার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল কি না গল্পের শেষে তা জানা যায় না ঠিকই, তবে পার্টিশনপূর্ব স্মৃতির উদ্ভাসন যে কখনও কখনও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কসহ সব পার্টিশন চিহ্নগুলিকেই চিরতরে চাপা দিতে, মুছে দিতে তৎপর হয় এ ধারণাটি যেন এক অতিকায় কঠোর সত্যি হয়ে গল্প শেষে আত্মপ্রকাশ করেছে। উত্তর প্রজন্মের দুনিয়ায় অর্থ যে জীবন জটিলতাকে সৃষ্টি করে, যে পার্থিব বাস্তবতার অনুপ্রবেশ ঘটায় তার কাছে ছিন্ন শিকড়ের আত্মানুসন্ধান যে কানাকড়িও মূল্য পায় না—গল্পটি এখানে সেই সত্যটিকেই বাস্তবায়িত করে তুলেছে। যে নিবিড় অতীত সত্তার পরিচিতি আমাদের জীবন ও জন্ম সংলগ্ন অধিকার, এমনকি আমাদের প্রজন্মবাহিত উত্তরাধিকারও বটে, তাকেই যখন পুনর্গঠিত সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় তখনই সেই স্মৃতিতন্ময়তার আর কোনো অর্থ থাকেনা আর সেই ব্যর্থতার হাহাকার আমাদের ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়, আমাদের দম বন্ধ করে তোলে—ঠিক প্রভাময়ীর মতোই। সেদিক থেকে এ গল্পের 'দমবন্ধ' নামটিও সার্থকভাবেই প্রতীকায়িত।

শেষ যে গল্পটি নিয়ে আলোচনা করবো, তাঁর নাম 'দেশের কথা গাঁয়ের কথা'। এটি গল্পের মাঝে আর একটি গল্প। আশ্চর্যের বিষয় যা, তা হলো গল্পের বিষয়স্তর বিচারে নামকরণটি আপাতভাবে মেলে না, তবে এর একটি তাৎপর্যগত অর্থ আছে। গল্পটি ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সত্য ও অত্যুজ্জ্বল চরিত্র অবলম্বনে লেখা ও একটি কিংবদন্তি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চরিত্রটির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মূল কিংবদন্তিটির বর্ণনাকারী একালের বীরাঙ্গনা দাসী আর শ্রোতা ফণিভূষণ। আবার কিংবন্তির অন্যতম চরিত্রটি হলো দত্তবাড়ির পরিচারক নগেন। মূলতঃ নগেনের মুখেই বিবৃত হয়েছে মধু-কবির কাহিনীর অংশটি। সেই কাহিনীতে জানা যায়, কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামের জমিদার রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র, বংশের একমাত্র প্রদীপ, দত্ত পরিবারের সবার প্রিয় মধুসূদন বহুদিন পর ফিরে এসেছেন আপন গাঁয়ে। নদীর ধারে লেগেছে তাঁর বজরা। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্ম নেওয়া বির্ধর্মী পুত্রের মুখদর্শন করবেন না বলে জানিয়েছেন পিতা রাজনারায়ণ। তাই নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করা হবেনা জেনেই নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে সাময়িক অবস্থান করছেন মধুসূদন। একদিকে পিতার কঠোর পণ আর অন্যদকে গ্রামের বছির চাচা, ছমিরুদ্দি, নেপাল কাকা—সবাই চায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক। ধর্ম থেকে সম্পর্ক বড়, মা-বাবার মন পাষাণ নয়, একবার মধু ফিরে গেলে তাকে বুকে তুলে নেবেনই তারা, এ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু মধু ফিরে যেতে চায় না, সে কালাপানি পার হবে, মাদ্রাজ যাবে—অনেক বড় কবি হওয়াই তাঁর জীবনের স্বপ্ন। নগেন ফিরে যায়। মা জাহ্নবীকে জানায় মধুর কথা। পুত্রমুখ দর্শনের জন্য মা কাতর হয়ে ওঠেন। রাতের অন্ধকারে মধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য নগেনের সাথে কপোতাক্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি। ওদিকে বদ্ধ গৃহের বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে বিনিদ্র রাজনারায়ণের পুত্র-দুখে বুক ফাটে।

বীরাঙ্গনা দাসীর বলা কিংবদন্তি কাহিনীটির শেষটা দু রকম। কেউ বলে মা জাহ্নবী পৌঁছে আর দেখতে পান নি মধুকে, কারণ তার আগেই নাকি মধুর নৌকা ছেড়ে গিয়েছিল কপোতাক্ষের ঘাট। মা জাহ্নবী শুণ্য হৃদয়ে আছড়ে পড়েছিলেন মাটিতে। তাঁর চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল ঘাটের মাটি। আর তারপর থেকেই সে ঘাটের নাম হয়েছিল 'অশ্রুঘাট'। তবে অন্য একটি ঘটনাও আছে। বীরাঙ্গন দাসী জানায় সে ঘটনার কথা। মধু কবির সাথে দেখা হয়েছিল গভীর নিশীথে মা জাহ্নবীর কপোতাক্ষের ঘাটে। কিন্তু শত অনুরোধ আর মায়ের চোখের অশ্রুও ঘরে ফেরাতে পারেনি মধুকে। জীবনের মহৎ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে মধু ক্ষুদ্র স্নেহের টান ছিন্ন করে অবশেষে সাগরপারে রওয়ানা হয়েছে।

গল্পটি অমর মিত্রের লেখা 'দশমী দিবসে' উপন্যাসের অংশ। দেশভাগ পরবর্তী জীবনে বীরাঙ্গনার যন্ত্রণাবিদ্ধ মাতৃহৃদয়ের অনুভূতিকে তুলে ধরতে মধু-কবির কিংবদন্তিটিকে এ গল্পে রূপকার্থে প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বীরাঙ্গনা হারিয়েছেন তার পুত্রকে। কপোতাক্ষের ধারে দাঁড়ালে তারও ছেলের জন্য হু হু করে ওঠে বুক, মা জাহ্নবীর মতোই। ধর্ম আর তার হানাহানি যে কিভাবে সন্তানকে কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় তা তো এতযুগ পরেও বুঝেছে মা বীরাঙ্গনা। তাইতো সে আঁচলে কান্না ভেজা চোখ চাপা দিয়ে ফণীকে বলেঃ **"ফণী, আর কি হবে দেখা?—ফণিভূষণ বলল, গোলমাল মিটে শান্ত হোক্, তোমার সঙ্গে আমি যাব।–বীরাঙ্গনা বলল, এতো মেটার নয়, ধর্ম নিয়ে আলাদা হলে আর কী মেলে?—ফণিভূষণ বলল, যখন মানুষ একা হয়, বোঝে না কি?—বীরাঙ্গনা বলল, জোট বাঁধে যদি ধর্ম নিয়ে তবে সে জোট ভাঙে না।"**[২৩] এ কথোপকথন থেকে বেশ বোঝা যায়, ধর্মের এ ডামাডোলে বীরাঙ্গনার তার পুত্রকে ফিরে পাবার আশা শুণ্য। অন্যদিকে দেশভাগ আর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ফণিভূষণের হৃদয় যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয় তার কথায়ঃ **"ফণি বলে, সেই নগেনের সঙ্গে আমার কতই বা তফাত মাসি, আমি শুধু হিসেব জানি, আমার মালিক শিউপ্রসাদ আগরওয়াল আমারে খুব পছন্দ করে। লোকটার ব্যবসা ছিল যশোরেও, যেত আসত। সে সব গেছে। শিউপ্রসাদ আমারে দিয়ে খাতা সারে। আসল খাতা, নকল খাতা। আমি তাই করি। শিউপ্রসাদ বলে, বাবু তুমি ভালো করে কাজ করো, তুমি অভাবে থাকবে না। তোমার সব আশা পূরণ হবে। তুমি রিফ্যুজি, হামি ভি রিফ্যুজি, যদিও কলকাতায় আমার সব ছিল, যশোরে যা ছিল তা গেছে কিছু। বাকিটা আমি আনতে**

পেরেছি। মাসি, আমি শুধু খাতা সারতে পারি। সত্যি মিথ্যে যেমন বলে আমার মালিক শিউপ্রসাদ আমি তেমনি পারি। তা বাদে আমি অন্ধ। আমি আর কিছুই দেখতে পাই নে, আমি কালা, আর কিছুই শুনতে পাইনে আমি।"[২৪] ফণিভূষণও যেন কিংবদন্তির নগেনের মতোই। কিংবদন্তির নগেন যেমন পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ের বেদনা আর পুত্রের আকুলতা বুঝতে পেরেও ফিরিয়ে আনতে পারে নি মধুদাদাবাবুকে, ছা-পোষা ফণীকেও তেমনি ভাবে যুদ্ধের বাজারে শিউপ্রসাদের গোলামি করে যেতে হয়, মিথ্যের বেসাতিতে সঙ্গ দিতে হয় দিনের পর দিন, মালিকের দেওয়া লোভের আশ্বাসেই। উল্লেখ্য 'বীরাঙ্গনা' নামের চরিত্রটিও মধুসূদনের কাব্য ('বীরাঙ্গনা') অবলম্বনে গৃহিত। দেশভাগ বিষয়ক লেখকের অন্যান্য গল্পের তুলনায় এ গল্পের গঠন-কাঠামোটি দুর্বল।

একথা সত্য যে, পার্টিশন ভিত্তিক নারকীয় ট্রমা ওপার বাংলার লেখক হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা' ('জীবন ঘষে আগুন' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত), 'পরবাসী', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'উত্তর বসন্তে' ('সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত) গল্পে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে অমর মিত্রের গল্পের ভাবাবেদন তার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, কিন্তু একইসাথে একথাও ঠিক যে, এক্সোডাসের অপ্রত্যক্ষতাও একজন গল্পকারকে অন্যভাবে তার নিজস্ব সৃষ্টির ভূবনে নিয়ে যেতে পারে, নাহলে একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস লেখক থেকে লেখকে পাঠকের মনে অন্য স্বাদের জন্ম দেয় কি করে? পার্টিশনের ঘটনাগত ফলের পাশাপাশি তার এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানের দিকও রয়েছে, যে মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানের ভাবনাগুলি নানাতর রূপে কখনও ব্যক্তিক, কখনও পারিবারিক, আবার কখনও বা সমষ্টিকেন্দ্রিকতার পথ ধরে আপামর সামাজিক মানুষের হয়ে যায়। অমর মিত্রের পার্টিশন ভিত্তিক গল্পগুলি আমাদের মনের মাঝে প্রজন্মান্তর ধরে পড়ে থাকা, পলি চাপা পড়া সেই প্রশ্নগুলিরই মনন ভিত্তিক বিশ্লেষণে আগ্রহী করে তোলে। আমরা জানি, পার্টিশন ভিত্তিক অভিজ্ঞতার অনেকটাই স্মৃতিসূত্র বাহিত, সেখানেও প্রত্যক্ষত ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সংখ্যা কম। খুন, গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গার ইতিহাস বা হিংসা-ক্লেদ-রক্ত বাহিত মর্মন্তুদ ও অমানবিক যে কাহিনীগুলি আমাদের সে বিকট অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সে অতীতও প্রায়শঃই সত্যের এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। উর্বশী বুটলিয়া তো দেখিয়েছেন নারীরা সেই স্মৃতির পুনঃপ্রকাশেও কতটা নীরব, আর সে নীরবতাকেই বিপরীত দিক থেকে তিনি পড়তে চেয়েছেন তাঁর 'দ্য আদার সাইড অব্ সাইলেন্স'-এ। একদিকে ট্রমা, ভায়োলেন্স আর অন্যদিকে উদ্বাসন, ছিন্নমূল ভগ্ন জীবন, আত্মপ্রবঞ্চনা আর পরিবর্তিত মানুষী মূল্যবোধ দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে কাহিনীগুলির জন্ম দিয়েছে তার সবটা মিলেই পরবর্তী উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভূমিকা নির্মিত হওয়া সম্ভব। মনে রাখতে হবে, দেশভাগ পরবর্তী ভাঙন ও বিচ্ছেদের বেদীতে লেখা অমর মিত্রের গল্পগুলি পরবর্তী প্রজন্মের চোখ দিয়ে দেখা স্মৃতি ও স্বপ্নসম্ভব কল্পনারই এক বাস্তব রূপায়ণ। সৃজনের পথ যে সবসময়ই প্রত্যক্ষ স্মৃতিবাহিত হবে এমনটা নয়, বরং সমকালীন অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও সংকট, জীবন-জটিলতা, আত্ম-চিহ্নায়নের পথ দিয়ে 'রিভার্স ওয়ে'-তেও দেশভাগের সে পটভূমিতে গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে—দেশ-বিচ্ছিন্নতার এক কল্পলোক থেকে শুরু করা যেতে পারে ছিন্ন শিকড়ের আত্মানুসন্ধান। অমর মিত্রের গল্পগুলি সেইভাবেই জীবনকে ফিরে দেখার এক শুভ প্রয়াস। এ যেন পার্টিশন-ভাবনার এক বিকল্প মানবিক ইতিহাস, যাতে হারানো দেশ আর হারানো মানুষের স্মৃতি এক নতুন পুনঃপ্রত্যক্ষতা পায় পাঠকের অধিমানসিক স্তরে। বর্তমান প্রজন্ম রূপে এই অধিমানসিক স্তরে অবস্থান করেই তাঁর চোখ দিয়ে দেখা '৪৭-এর স্বাধীনতা ও দেশভাগ, '৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪-এর ছিটমহল কিংবা শাহবাগ আন্দোলন, ২০১৫-এর তিস্তা জলবন্টন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক ক্রমিক বর্ণমালার মতো সাজিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি তাঁর গল্পে। সেদিক থেকেও লেখকের চেতনা জগৎ বাংলা কথাসাহিত্যে এক সার্থক সামীপ্যের সমীকরণে যুক্ত হতে পেরেছে।

উল্লেখপঞ্জী :

১ যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা, অন্নদাশংকর রায় দ্রষ্টব্য
২ 'নদীর ওপার', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪৬
৩ 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে', ২০০১, মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, দে'জ পাবলিশিং; প্রথম সংস্করণ
৪ 'অলীক ক্রন্দনধ্বনি', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭৫
৫ 'সৌদামিনী ও সুরদাস', তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৬২
৬ 'হোসেন মিঞার নাও', তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮৯
৭ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯২
৮ 'সাঁকোবাড়ি', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১৯
৯ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১৯
১০ 'বনহংসীর দেশ', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩২
১১ 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল', তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯৪
১২ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯৮
১৩ 'অন্ন-পরমান্ন', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬৬
১৪ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬২
১৫ 'চোখ আর নদীর জল', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১১
১৬ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১৪
১৭ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১২
১৮ 'হারানো নদীর স্রোত', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪৭
১৯ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৫৪
২০ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬১
২১ 'দমবন্ধ', দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮০
২২ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮৬
২৩ 'দেশের কথা গাঁয়ের কথা',দেশভাগঃ হারানো দেশ হারানো মানুষ,অমর মিত্র,সোপান,প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪৫
২৪ তদেব, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. হারানো দেশ হারানো মানুষ, দেশভাগ, অমর মিত্র, সোপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা

২. মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাস রচনা এবং এই সময়, মইনুল হাসান, রূপালি পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, কলকাতা

৩. ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, অশ্রুকুমার সিকদার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা

৪. বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, ২০০০, কলকাতা

৫. বাংলা উপন্যাসে **দেশভাগ ও** দেশত্যাগ, তারক সরকার, অরুণা প্রকাশন, ২০০৯, কলকাতা

৬. পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি, মননকুমার মন্ডল (সম্পাদনা), গাঙচিল, কলকাতা

৭. দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শহিদুল ইসলাম, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, কলকাতা বইমেলা

৮. **পলাশি থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস), শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩**

৯. দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা, সম্পাদনা সেমন্তী ঘোষ, চতুর্থ মুদ্রণ, অগস্ট ২০১৬, কলকাতা

১০. দেশভাগ: বিভাজনের রক্তাক্ত পদচিহ্ন, ড. মাহফুজ পারভেজ, নভেম্বর ২০১৫

ওয়েসাইটঃ

http://bangla.samakal.net, ০৫.০৯.২০১৬
http://bn.wikipedia.org